কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আগস্ট ১৯৮৬

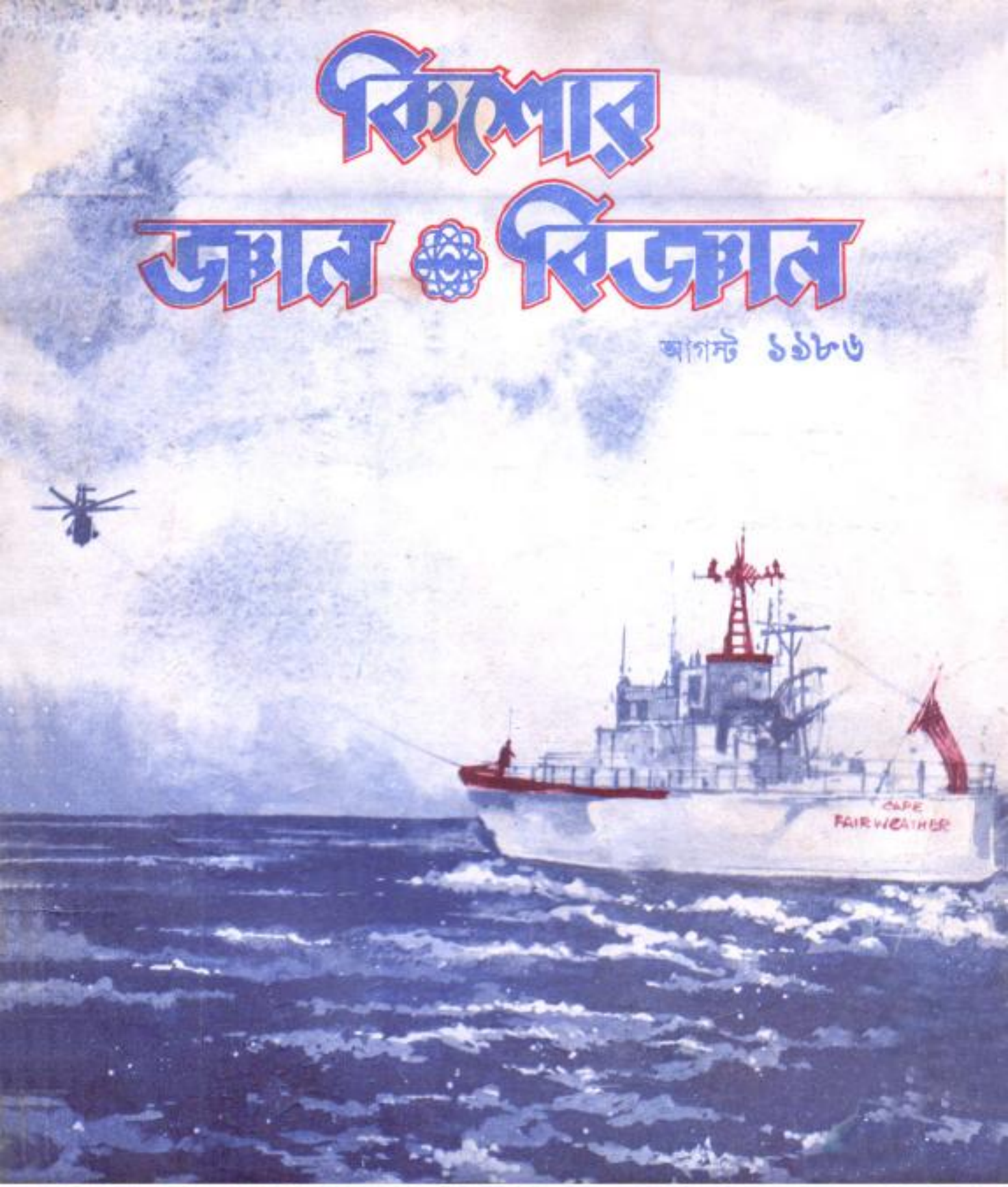

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

চিরকালের সেরা

পুজো সংখ্যায়

৬টি উপন্যাস

৬টি গল্প এবং

৬টি অনুবাদ গল্প

লিখবেন

নারায়ণ সান্যাল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সমরজিৎ কর

অদ্রীশ বর্ধন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সিদ্ধার্থ ঘোষ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

লীলা মজুমদার

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বিমল কর

কিন্নর রায়

শঙ্কর ঘটক

সৌরেন ভট্টাচার্য

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

অনীশ দেব

চণ্ডী সেনগুপ্ত

ষষ্ঠ বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা আগস্ট 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : **দপ্তর থেকে** : সুদূর অতীতে । সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : তুষার কন্যা (কিরব্‌লিশেও) । অনুবাদ : চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত 47 : সিলভার বার্ড । শঙ্কর ঘটক 31

বিশেষ রচনা : সাগর মাঝে ত্রাণ ও উদ্ধার । মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় 19

পড়াশোনা : পদার্থবিজ্ঞানের কথা । অজয় চক্রবর্তী 15 : কিছু মজাদার সমীকরণ । সজল চক্রবর্তী 16 : বাষ্প মোচন । দিনোজকুমার দে 17 : রসায়নে যোজ্যতা । অমরনাথ রায় 51

ছবিতে গল্প : খুদে বিজ্ঞানী । দিলীপ দাস 23 : ওয়্যার অব দি ওয়ার্ল্ডস । গৌতম কর্মকার 43

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : আর্দেশীর কার্শেটজী । বিমলেন্দু মিত্র 27

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা : 24 ঘণ্টায় একদিন কেন । শ্যামাপদ দাস 49 : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ । বরুণ মজুমদার 50 : প্রথম সংবাদপত্র কোথায় ছাপা হয়েছিল । লতিকা দত্ত 30 : পরমাণু বোমা ও তার ভয়াবহতা । দীপাঞ্জন মিত্র 39 : বিজ্ঞান সংবাদ 54 : মজার ইলেকট্রনিকস্ প্রজেক্ট । পার্থসারথি চক্রবর্তী 52 : হাতি সেকালের সাঁজোয়া গাড়ি । শৈবাল চক্রবর্তী 9

আবিষ্কারের গল্প : নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কারের কাহিনী । বরুণ মণ্ডল 29

রঙীন ফিচার : প্রাণী-বৈচিত্র্য । শৈল চক্রবর্তী । ভাস্কো-দা-গামা ভারতে । কিন্নর রায় 12 : সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজ 14 : কণ্টক লিপি । এণাক্ষী বিশ্বাস 55 : থার্মোমিটার । অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 56 : আই কিউ টেস্ট 57 : জিবসাইট । অমরনাথ রায় 57 : জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটোক্যুইজ 58

জীবজন্তু ও গাছপালা : স্প্যানিশ ফ্লাই । সলিল রাহা 22 : মাছেদের ভাষা । শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় 42

ধারাবাহিক উপন্যাস : নরবানরের গ্রহে । অদ্রীশ বর্ধন 35

ছোটদের দপ্তর : সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, ফোটো ক্যুইজ ও আই কিউ টেস্টের উত্তর-দাতাদের নাম 59 : হাইগ্রোমিটার । সিদ্ধার্থ সরকার 61 : কারবাইট গ্যাস স্টোভ্ । রাজেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী 62 : প্রশ্নোত্তর । সুধাংশু পাত্র 63 : শব্দকুট । সুগত ব্যানার্জী 66 : শব্দকুট, জুনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজের সমাধান 58 : আই কিউ টেস্টের সমাধান 57 : সিনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজের সমাধান 14

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল । **অন্যান্য ছবি** : অলয় ঘোষাল ও পার্থসারথি মণ্ডল

আলোক চিত্র : কল্যাণ চক্রবর্তী, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ রায়

প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর সম্পাদক রবীন বল সহসম্পাদক জয়ন্ত দত্ত

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী—কমন

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি এই বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকা ফেব্রুয়ারি, 1986 সংখ্যায় শ্রীদিনোজ কুমার দে মহাশয় লিখিত "জীবন বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী" থেকে একছর 66·.5% common এসেছে। লেখককে ধন্যবাদ জানাই। নিচে তৈরি ছকটি দেখলেই বোঝা যাবে।

বিষয় : জীবন-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, 1986 "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" পত্রিকা

Suggestion-এর প্রশ্ন নম্বর	1986 সালের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন নম্বর	যত নম্বর Common এসেছে
17	12 ক, গ	4
13	14 খ, গ	4
7	11	7
8	10	2
12 (a)	13 ক	3
7	9	2
3 (b)	12 খ	2
5 (a)	7	7
3 (b)	6	7
18 (v)	3	7
1 (a)	4	4
1 (b)	5	5
		53

শতকরা Common আসার হিসাব

মোট 80 নম্বরে Common এসেছে 53 নম্বর

∴ 100 নম্বরে Common এসেছে 66·25%

নমস্কারান্তে, সুস্মিতা পাল, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর।

মে সংখ্যায় প্রকাশিত সোমা দাসের বক্তব্য অনুসারে আমিও এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্নাবলী থেকে 83·33% কমন পেয়েছি। আর দিনোজ কুমার দে লিখিত জীবন বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে কমন পেয়েছি 67·77%। এজন্য আমি উভয় লেখকের কাছেই কৃতজ্ঞ। এবং ঋণী কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার কাছে।

মোহন চন্দ্র কোলা, গ্রাম ও পোঃ হরেকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর।

মে' সংখ্যায় প্রকাশিত সোমা দাসের পত্রের প্রসঙ্গে জানাই তিনি কি 12 (a) এবং 15 (c) প্রশ্নটির নম্বর পর পর দুবার যোগ করেছেন? তার ছকের মধ্যে আরও কিছু অসঙ্গতি আমরা খুঁজে পেয়েছি। এবং আমাদের হিসেবে ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্নাবলী থেকে 83·33% এর অপেক্ষা কম প্রশ্ন কমন এসেছে।

দেবব্রত সরকার, তারা সুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন, হাওড়া।

ফেব্রুয়ারী কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী থেকে 80% কমন পাওয়ায় লেখক ও পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

আশিস পাত্র, শিপ্রা পাত্র, কৌশিক পারাল। রসপুর, হাওড়া।

কোনটা ঠিক ?

1986 মার্চ সংখ্যায় বুদ্ধি নিয়ে খেলায় (পৃঃ-16) একটি ভুল রয়ে গেছে। তিন এর উত্তরে রয়েছে— 'একমাত্র (b) ছবিতেই গিঁট পড়বে; (a) ও (b)-এর ফাঁস খুলে যাবে'।

(b) দুবার আছে। আমি উত্তরটি করতে পারি নি। সত্যিকার কোনটা হবে! প্রথমবারে c হবে না শেষ বারে c হবে? দয়া করে জানাবেন।

অংশুমান কর, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

আমি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক। জানুয়ারী '86 সংখ্যার প্রচ্ছদটি খুবই আকর্ষণীয়। এই ধরনের প্রচ্ছদ পত্রিকাটিকে আরও জনপ্রিয় করতে সাহায্য করবে কোন সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই সংখ্যাটিতেই রকেট কুট-এ একাধিক ভুল আছে। এই ধরনের যে কোন জায়গায় ভুল পত্রিকার মান কমাতে যথেষ্ট। লেখকের উচিত এই রকম ভুল না করা।

মহম্মদ ফারুক,

বুড়দা হাইস্কুল, পুরুলিয়া।

পত্র-পত্রিকা বিনিময়

আমি নিয়মিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহে রাখি। যদি কোন ত্রিপুরা-বাসী বা বাংলাদেশবাসী পাঠক/পাঠিকা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে ঐ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞানের যে কোন পত্র-পত্রিকা বিনিময়ে আগ্রহী থাক, তবে নিচের ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানালে উপকৃত হব।

সুব্রত মাঝি,

ত্রিবেণী টিস্যু (বি-90), চন্দ্রহাটি, হুগলী।

কেন এই 'ঘনাদা' সংখ্যা

'ঘনাদা সংখ্যা'র প্রকাশ ও 'ঘনাদা ক্লাব' প্রতিষ্ঠায় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার উদ্যোগে পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে এক অভিনব নজীর হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্যে ঘনাদার মতো জীবন্ত চরিত্র খুঁজলে হয়তো দু'একটা পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা বা একটা আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার কথা এর আগে আর কেউ ভাবে নি।

বস্তুতঃ ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাব গড়ে তোলার ব্যাপারে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে যখন চিঠিপত্র প্রকাশিত হত তখন পত্র লেখকদের মধ্যে আমিও দু-একটি চিঠি লিখেছিলাম—নিতান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্যেই। অবশেষে সায়েন্স ক্লাব ও ঘনাদা ক্লাব তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করবে—এ খবরও পত্রিকার মারফতে জানতে পারলাম। ঘনাদা চর্চার ফাঁকে ফাঁকে ঘনাদা ক্লাব বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পাঠের চর্চা ও আসরের কথাও ভাবতে পারেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘজীবী হোক।

রবীন বসু, কল-36

জুন সংখ্যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ ঘনাদা সংখ্যায় কিছু ভুল নজরে পড়ল। অতসি সেন লিখেছেন 205 নং বেকার স্ট্রীটের (হোমসের আস্তানার) (পৃঃ 27) ইত্যাদি। আবার ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য 'বিজ্ঞানী ঘনাদা'র 4র্থ প্যারাগ্রাফে লিখেছেন 21 নং বাড়িটি ছিল শার্লক হোমসের। ভুলটি কি ইচ্ছাকৃত ? জানি না। আসলে গল্পের শার্লক হোমসের ঠিকানা হল—221 বি. বেকার স্ট্রীট। 50 পৃষ্ঠায় শিল্পী ধীরেন বলের চোখে ঘনাদা-র লেখায় মারাত্মক ভুল। ডান দিক বাঁদিক উল্টো হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ছাপাখানার ভূত তাড়াতে আরও যত্নবান হবেন আশা করি।

মদন মোহন সামন্ত, যাদবপুর, কল-32

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা। এতে দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের খবরই বেশি ছাপা হবে আমরা আশা করব। সেক্ষেত্রে ঘনাদাকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন ?

চন্দন কুমার মাইতি, মুর্শিদাবাদ।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা জুলাই সংখ্যায় জানতে পারলাম। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘনাদা সংখ্যা অনেকের ভালো লেগেছে আবার হয়তো কারো কারো ভালো লাগে নি। আমার বক্তব্য ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মসূচীতে আরও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ থাকা উচিৎ। যেমন বাংলায় প্রকাশিত বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। সেক্ষেত্রে অনেক লেখকের অনেক লেখাই আলোচনায় স্থান পেতে পারে।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-26

জুন সংখ্যায় ঘনাদাকে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রচার করা হয়েছে। এতে আপনাদের বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোন অর্থকরী লাভ আছে কিনা জানি না, তবে জুন সংখ্যায় পাঠকদের জোর করে ঘনাদা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কি ?

সুখেন্দু মুখার্জী, দুর্গাপুর 4, বর্ধমান

ফ্রিজের বিকল্প পিরামিড ?

আমার লেখা 'মহান পিরামিড ঃ ভবিষ্যতের প্রশ্নস্মৃতি' পড়ে অনেক পাঠক প্রশ্ন করেছেন ঃ পিরামিড ফ্রিজের বিকল্প হিসাবে প্রচারিত নয় কেন ? উত্তরে জানাই আমাদের দেশে পিরামিডের প্রয়োগ কাজে না লাগলেও বিদেশে অনেক কাজেই পিরামিড ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরনো ব্লেড শান দেওয়ার ব্যাপারে, মাথা ধরলে পিরামিডের টুপি, এমনকি পিরামিডের জল জীবাণু নাশক হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন না এমন নয়, তবে সিদ্ধান্তের পর্যায়ে আসেন নি।

প্রমাণ মাপের পিরামিড তৈরির ব্যয় ফ্রিজের চাইতে দশভাগ কম হলেও ঐ বিশাল বস্তুটিকে রাখার ব্যাপারটা কি পত্রলেখক ভেবে দেখেছেন। ফ্রিজের সব গুণাবলী কি পিরামিড থেকে পাওয়া যাবে ? বেশ কয়েকদিন ধরে রাখা জান্তব বস্তুর মমিভূত অংশও কি খেতে স্বাদু হবে ? ফ্রিজের বিকল্প পিরামিড—একটি কষ্টসাধ্য কল্পনা।

কাজল ভট্টাচার্য। কল-2

ফ্রিজের চাইতে পিরামিডের নির্মাণে ব্যয় কম হলেও ফ্রিজের অনেক সুবিধা থেকেই পিরামিড বঞ্চিত। শুনেছি একটি পিরামিডের মধ্যে নাকি কয়েকটি ফুটবল মাঠের সমান জমি থাকে। তা হলে এটি রাখা হবে কোথায় ?

শ্যামাপদ নস্কর। কল-30

কার্নালাইটের রাসায়নিক সংযুতি

মে সংখ্যায় কার্নালাইটের রাসায়নিক সংযুতি ভ্রমক্রমে $KC\,MgCl_2\,6H_2O$ ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে ঃ $KCl\,MgCl_2,\,6H_2O$।

প্রগতি ও সমৃদ্ধির নয় বছর

পশ্চিম বাংলা এগিয়ে চলেছে এক নতুন পথে

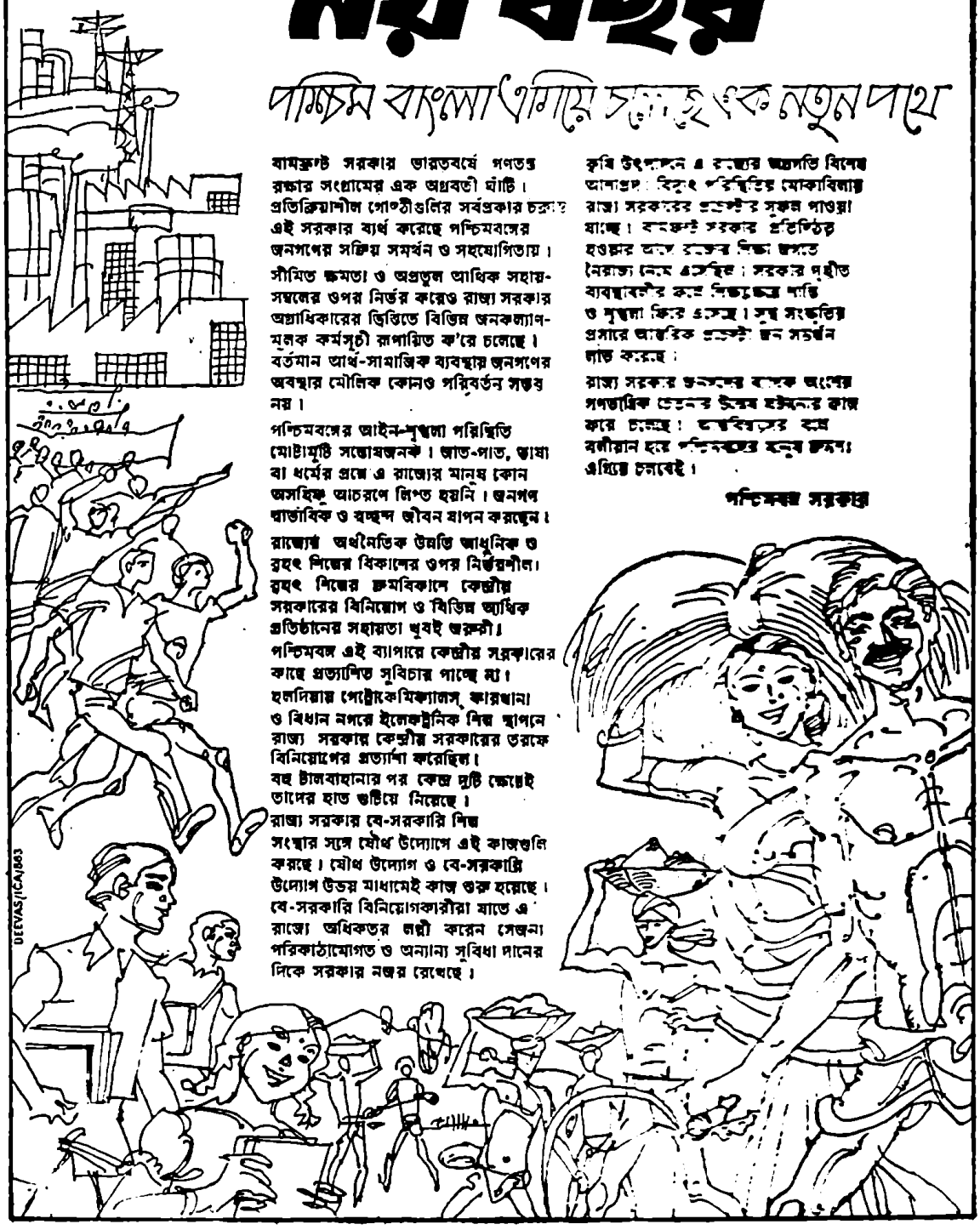

বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের এক অগ্রবর্তী ঘাঁটি। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির সর্বপ্রকার চক্রান্ত এই সরকার ব্যর্থ করেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায়।

সীমিত ক্ষমতা ও অপ্রতুল আর্থিক সহায়-সম্বলের ওপর নির্ভর করেও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জনকল্যাণ-মূলক কর্মসূচী রূপায়িত ক'রে চলেছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণের অবস্থার মৌলিক কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক। জাত-পাত, ভাষা বা ধর্মের প্রশ্নে এ রাজ্যের মানুষ কোন অসহিষ্ণু আচরণে লিপ্ত হয়নি। জনগণ স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করছেন।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি আধুনিক ও বৃহৎ শিল্পের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। বৃহৎ শিল্পের ক্রমবিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা খুবই জরুরী। পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার পাচ্ছে না। হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালস্ কারখানা ও বিধান নগরে ইলেকট্রনিক শিল্প স্থাপনে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিনিয়োগের প্রত্যাশা করেছিল। বহু টালবাহানার পর কেন্দ্র দুটি ক্ষেত্রেই তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার বে-সরকারি শিল্প সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কাজগুলি করছে। যৌথ উদ্যোগ ও বে-সরকারি উদ্যোগ উভয় মাধ্যমেই কাজ শুরু হয়েছে। বে-সরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে এ রাজ্যে অধিকতর লগ্নী করেন সেজন্য পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা দানের দিকে সরকার নজর রেখেছে।

কৃষি উৎপাদনে এ রাজ্যের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাজ্যের শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। সরকার গৃহীত ব্যবস্থাবলীর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে আন্তরিক প্রচেষ্টা জন সমর্থন লাভ করেছে।

রাজ্য সরকার জনগণের ব্যাপক অংশের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজ করে চলেছে। ঐক্যবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্রমশঃ এগিয়ে চলবেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

DEEVAS/ICA/863

সুদূর অতীতে সমরজিৎ কর

এক সময় আফ্রিকা এবং আরব্য উপদ্বীপের সঙ্গে এশিয়া এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে কোন স্থল-যোগাযোগই ছিল না। তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বেশ কয়েকটি সমুদ্র। হলে কি হবে? পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডই তো আর এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই? তারা সব সময়ই স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ করে। অবশ্য খুবই ধীর গতিতে। ধরো, বছরে বিশ পঁচিশ সেন্টি-মিটার? পরস্পর বিচরণ করতে করতে, আজ থেকে এক কোটি সত্তর লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা এবং আরব্য উপদ্বীপের সঙ্গে ভূ-সংযোগ গড়ে ওঠে ইউরোপ এবং এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের। দুটি ভূখণ্ড যখন পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এসে চাপ সৃষ্টি করে, সেই চাপে ভূস্তরের কিছুটা অংশ উপর পানে উঠে আসে। উঠে এসে সৃষ্টি করে পাহাড় পর্বত। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সৃষ্টি হল বেশ কয়েকটি পর্বতমালা—ইউরোপে আল্পস্, তুরস্কে টরাস পর্বতমালা এবং ইরানে জাগরোস পর্বতমালা। স্থলভাগ সরে আসার দরুন সমুদ্রগুলিও স্থান পরিবর্তন করল। আর জানোই তো, সমুদ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু? এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। ওই সব অঞ্চলের আবহাওয়াও গেল পালটে।

নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই সময় আরো একটি মজার ঘটনাও ঘটেছিল। এর আগে ওই অঞ্চলের ভূখণ্ড-গুলি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সৃষ্টির পর থেকে এক একটি ভূখণ্ডের প্রাণী সেই ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল আবদ্ধ। কিন্তু ভূখণ্ডগুলির মধ্যে স্থল-সংযোগ হওয়ার পর তাদের অনেকে সেই সব স্থলপথ ধরে শুরু করল যাতায়াত। আবহাওয়ার পরিবর্তনের দরুন কোন কোন অঞ্চলের অরণ্য নষ্ট হয়ে গেল। সেই সব অঞ্চল তাদের পক্ষে আর বাস করার মতও ছিল না। নতুন আশ্রয় এবং খাদ্যের জন্যে তারা দলে দলে ওই সব স্থলপথ ধরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই দলে 'হোমিনয়েড'ও (hominoid) ছিল। হোমিনয়েড বানরও নয়, মানুষও নয়, তাদের মাঝামাঝি এক শ্রেণীর প্রাণী। পৃথিবীর বুক থেকে বহুদিন আগেই তারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, অজ্ঞাত কোন কোন অঞ্চলে এখনো বাস করছে তাদের বংশধর। তাঁরা সন্ধান পাচ্ছেন না।

তবু এই হোমিনয়েড নিয়ে কত রকমই না জল্পনা?

যেমন ধরো, কেউ কেউ বলছেন, আফ্রিকায় প্রথম 'হোমিনয়েড'-এর বিকাশ ঘটেছিল 'মাইওসেন' যুগে। মাইওসেন (miocene) ভূতাত্ত্বিক যুগ। এই যুগের শুরু দুই-কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ বছর আগে। ওইসব 'হোমিনয়েডে'র একটি গোষ্ঠী পৃথকভাবে বাস করতে থাকে। যারা চেহারা এবং স্বভাব চরিত্রে ছিল কতকটা গিবনের মত। আর এক গোষ্ঠীর 'হোমিনয়েড'-কে বলা হয় 'প্রোকনসুল আফ্রিকানুস'। এরা বাস করত গাছে, এদের খাবার বলতে ছিল ফল। আয়তনে বেবুনের মত। অনেকের ধারণা, এরাই নাকি পরে উন্নততর হোমিনয়েডে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবত এরাই আধুনিক মানুষের পূর্ব পুরুষ।

আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপ এবং এশিয়ার স্থল-সংযোগ তৈরি হলে বহু হোমিনয়েড, বিশেষ করে যাদের কথা এই মাত্র বললাম, তারা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন নতুন অঞ্চলে আসার পর তাদের মধ্যে দেখা দেয় বিবর্তন। তাদের দেহে এবং চালচলনে গড়ে ওঠে পরিবর্তন।

মুশকিল হয়েছে, ওই সব প্রাণীর পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে কিছু কিছু দাঁত এবং চোয়ালের জীবাশ্ম। এগুলি পরীক্ষা করে সে সময়ের হোমিনয়েড সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করার অবশ্য চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

যেমন ধরো এক প্রজাতির হোমিনয়েড। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্রাইওপিথেকাস'। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এরাই নাকি এখনকার গোরিলা, ওরাংওটাং প্রভৃতির পূর্ব পুরুষ। আর এক ধরনের হোমিনয়েডের জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'রামাপিথেকাস'। কেউ কেউ মনে করেন, এরা আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ।

মজার ব্যাপার হলো, 1932 সালে ভারতেই প্রথম পাওয়া গিয়েছিল মুখের উপরের অংশের চোয়ালের জীবাশ্ম। যে প্রাণীর এই জীবাশ্ম, বিজ্ঞানীরা তার নাম রাখেন 'রামাপিথেকাস'। 1910 সালে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ চোয়ালের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। যাদের সেই চোয়াল, বিজ্ঞানীরা তাদের নাম দিয়েছেন, 'শিবাপিথেকাস'। 1960 সালের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান এবং আফ্রিকা ও চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হোমিনয়েডের দাঁত, চোয়াল এবং মাথার খুলিরও জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। আফ্রিকায় এক ধরনের হোমিনয়েডের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। যাদের বলা হয় 'অস্ট্রেলোপিথাকাস'। দেখা

গেছে, তাদের জীবাশ্মের সঙ্গে রামাপিথেকাসের জীবাশ্মের বিস্তর মিল।

এই সব জীবাশ্ম নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড পিলবিম। তিনি মনে করেন, আজ থেকে আশি লক্ষ বছর আগে বেশ বড় রকমের একটি পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওই সময় বিকশিত হতে শুরু করে প্রাচীন মানুষের পূর্বপুরুষ এবং সেই সঙ্গে ওরাংওটাং-এরও পূর্বপুরুষ। চল্লিশ লক্ষ বছর আগে গোরিলা এবং শিম্পাঞ্জী পৃথক পৃথক প্রাণী হিসেবে গড়ে ওঠে।

একটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায় ইউরোপ এবং এশিয়ায়। প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ বছর আগে জিব্রাল্টার প্রণালীর মুখটি বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ভূমধ্য মহাসাগর। ভূমধ্য-মহাসাগর শুকিয়ে যায়। সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অভ্রভেদী ভূখণ্ড, এতকাল যাদের বাস ছিল সমুদ্রের গভীরে। মাঝে মাঝে হ্রদ অথবা জলা। তাদের জলে প্রচুর লবন। আবহাওয়াও পাল্টে গেছে অনেক। এমন পরিবেশে বহু উদ্ভিদ এবং প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যায়। আবার অনেকের মধ্যে চলে জৈবিক বিবর্তন। যেসব হোমিনয়েড মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে ছড়িয়ে যায়, তাদের মধ্যেও ঘটে দ্রুত পরিবর্তন। দু হাত এবং দু পায়ে ভর দিয়ে যারা চলা-ফেরা করত, তাদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠীতে এল পরিবর্তন। শুরু হল সম্পূর্ণ দুপায়ে ভর করে চলার পালা। সৃষ্টি হল আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ। তাদের দেহের পরিবর্তন হল। তার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটল তাদের মগজের। তারা বুদ্ধিদীপ্ত হতে লাগল।

কিন্তু কিভাবে ঘটল এই পরিবর্তন? শুধু মানুষের বেলাই বা ঘটল কেন?

পিলবিম বলেছেন, সেটাই তো রহস্য? পরিবেশ পরিবর্তন হয়ত একটি কারণ। দেখা গেছে আফ্রিকার ওরাংওটাং-এর মানুষের জীবকোষের 'ডি এন এ' এবং বিভিন্ন প্রোটিন অণুর সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। এ থেকে বলা যায়, ওরাংওটাং এবং মানুষ-এর জন্ম হয়ত একই সূত্র থেকে ঘটে থাকবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ যে কি ধরনের প্রাণী ছিল, এখনো পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন প্রমাণই আমরা পাই নি। এমন কোন প্রাণীর জীবাশ্ম এখনো পাই নি, যা প্রমাণ করে, তারাই সরাসরি মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। অজ্ঞাত সেই প্রাণীর নাম দেওয়া হয়েছে 'মিসিং লিংক'। বিজ্ঞানীরা সেই 'মিসিংলিংক' অনুসন্ধানেই হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন নানা অঞ্চল।

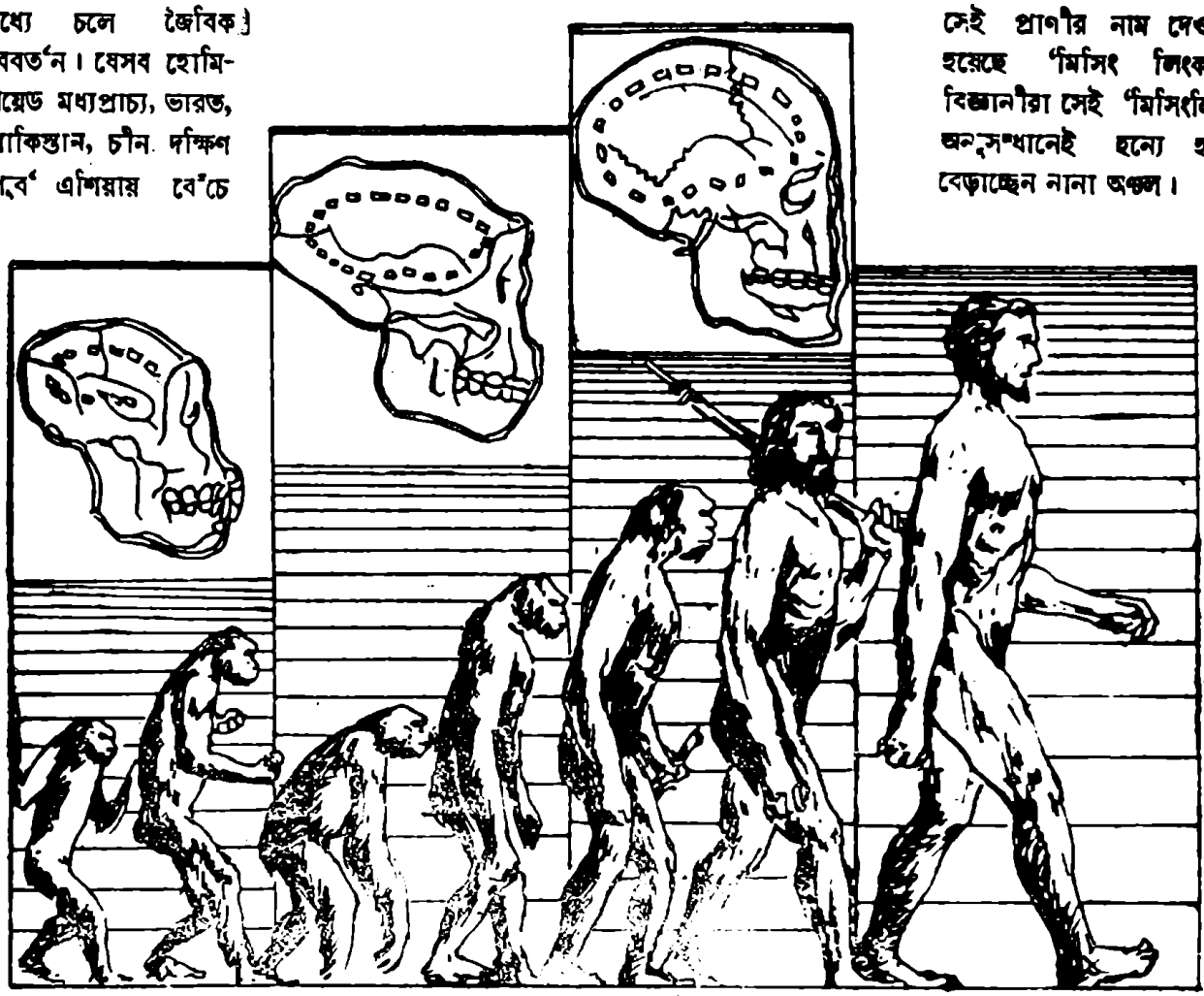

হাতি সেকালের সাঁজোয়া গাড়ি

শৈবাল চক্রবর্তী

দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয়ের স্বপ্ন অসম্পূর্ণ রেখে স্বদেশে ফিরে চলেছেন। সঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহিনী। আর সেই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে হাতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল যারা।

শুধু আলেকজাণ্ডার নয় যে কার্থেজের বীর হানিবলের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন হাতির পাল নিয়ে। এক বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে তাঁর আল্পস্ পেরিয়ে যাওয়া যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা।

তবে যুদ্ধের কাজে প্রথম হাতি ব্যবহার করে চীনারা। পীত নদীর তীরে শ্যাং বংশের লোকের বসতি ছিল কুড়ি হাজার বছর ধরে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে চৌ এদের বিতাড়িত করেন। শোনা যায় শ্যাংদের পতনের মূলে হাতির ছিল এক বিরাট ভূমিকা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সভ্য হয়েছে, উন্নত হয়েছে কিন্তু যুদ্ধকে বর্জন করতে পারে নি। বরং আগের চেয়ে এখন যুদ্ধের ধরন হয়েছে আরও জটিল আরও বিধ্বংসী। মানুষ তার বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নতুন অস্ত্র আবিষ্কার সম্ভব করেছে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগেও মানুষ লড়াই করেছে কিন্তু তখন অস্ত্র ছিল অন্যরকম আর হাতি ছিল সে যুগে যুদ্ধ প্রস্তুতির এক প্রধান উপকরণ।

খ্রিস্টপূর্ব 218র অক্টোবর মাসে হানিবল 20 হাজার সৈন্য ও 60টি হাতি নিয়ে আল্পসের বরফে ঢাকা দুর্গম গিরিপথে যাত্রা করলেন। কিন্তু এই অভিযানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর বাহিনীরই এক অংশ হাতির পাল। আল্পসের উচ্চতা এবং শীতে অনভ্যস্ত তাদের অনেকেই অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়ল এই যাত্রাপথ অতিক্রম করতে গিয়ে। খ্রিস্টপূর্ব 216-র এই যুদ্ধে 60,000 রোমান সৈন্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল তাঁর হাতে। সেকালে হাতির রণসজ্জাও ছিল দেখবার মত। তাদের শরীরের একটা অংশ ঢাকা থাকত চামড়ায়। বুক ঢাকা থাকত ভারী ধাতুর আচ্ছাদনে। তাদের পিঠে হাওদায় বসত তীরন্দাজ বা বর্শাধারী সৈন্যের দল। সশস্ত্র সৈন্যকে নিয়ে আগুয়ান হওয়া ছাড়া হাতি নিজেও তার সুগম্ভীর ডাক, ওজন এবং শুঁড়ের সাহায্যে বিপক্ষের মনে ত্রাস সঞ্চার করত। পলায়নপর শত্রুসৈন্যের পেছনে শুঁড় তুলে ধাবমান হাতি সে যুগে ছিল একটি পরিচিত দৃশ্য। প্রতিপক্ষের সৈন্যেরা যতই রণকুশল হোক মত্ত হস্তীযূথ ধেয়ে আসতে দেখলে তারা আতংকগ্রস্ত হবেই।

তবে একটা-বিপদও ছিল। হাতি একবার ক্ষেপে গেলে তার শত্রুমিত্র জ্ঞান লোপ পেত। অনেক সময় সে তার নিজের দলেরও ক্ষতি করত। হাতি বুদ্ধিমান প্রাণী কিন্তু যুদ্ধ না হলে কাউকে আক্রমণ করা তার স্বভাবে নেই। তাই যুদ্ধের হাতিকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হত কৌশলের। তারপর ক্ষিপ্ত হাতি যাতে তার নিজের দলের সৈন্যদের আক্রমণ না করে তার জন্যে রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি।

খ্রিষ্টপূর্ব 202তে জামার যুদ্ধে স্কিপিও হাতির এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ততদিনে রোমান সৈন্য কার্থেজীয়দের হস্তিবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে তারা হাতিকে তার নিজের দলের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। স্কিপিও হানিবলের হাতির পালকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যে একপাল শূকর ছেড়ে দেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যে শূকরের পালের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে না পারায় বিরক্ত হাতির পাল উল্টো দিকে ফিরে অনেক কার্থেজীয় সৈন্যকে পদদলিত করে। যুদ্ধে স্কিপিওর জয় হয়। বাহুবলের ওপর জয়ী হয় বুদ্ধিবলের।

এই যুদ্ধের পর থেকে হাতিকে যুদ্ধের কাজে লাগানোর উৎসাহে ভাটা পড়ে। যুদ্ধনায়করা বুঝলেন যে হাতিকে দিয়ে শত্রুপক্ষের মনে ভয় ও চমক সৃষ্টি করা যায়, তার বেশি কিছু নয়। তখন হাতি যে বাহিনীর কাছে একটা বোঝার মত এই সত্যটাই বেশি করে ধরা পড়ে। এর পর থেকে তাই ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে হাতিকে যুদ্ধ পরিকল্পনা থেকে বর্জন করা হয়।

এরপর হাতি হল চিড়িয়াখানা ও সাফারী পার্কের আকর্ষণ।

16, কালীবাড়ী লেন, ঢাকুরিয়া, কল-31

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

● বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হল।

● পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

● রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।

● প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।

● অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

● এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

কলকাতার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা !

তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। আমরা তোমাদের সকলের জন্যই ভাবি। তোমাদের খাবারে যাতে ভেজাল না থাকে, তোমরা যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাও, তার ব্যবস্থা আমরাই করি। শহরে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড আরও সব সংক্রামক রোগ যাতে না ছড়ায় তার জন্যে আমাদের ডাক্তাররা সজাগ। তোমাদের লেখাপড়ার জন্য আমরা অনেক স্কুল চালাই। খোলা হাওয়ায় যাতে তোমরা বেড়াতে খেলতে ব্যায়াম করতে পারো, তার জন্যে পার্ক, মাঠ, ব্যায়ামাগার আমরাই তদারক করি।

তোমাদের খেলাধুলো ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটুকু ব্যবস্থা আছে—আমরা জানি, প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। পুরনো এই শহরটাকে নতুন করে সাজানোর যে কাজ শুরু হয়েছে তার মধ্যে তোমাদের কথাও সকলে ভাবছেন। আপাততঃ তোমাদের জন্য যতটুকু ব্যবস্থা আছে, সেটুকু রক্ষণাবেক্ষণের দিকে সকলকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা ছোট হলেও আমাদের অনেকভাবে সাহায্য করতে পারো।

বাড়িতে ফাঁকা জায়গা থাকলে নতুন নতুন কিছু গাছপালা লাগিয়ে দাও। পার্ক বা রাস্তার গাছপালার পাতা ছিঁড়ো না। কলকাতার রাস্তাকে এরাই বিশুদ্ধ রাখে। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে নোংরা ফেলো না। নোংরা ময়লা জায়গা থেকে কখনও জল বা খাবার খেয়ো না। আর জল খেয়ে কল বন্ধ করতে কখনও ভুলো না—তাহলে খাবার জল অপচয় হবে।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

প্রাণীবিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

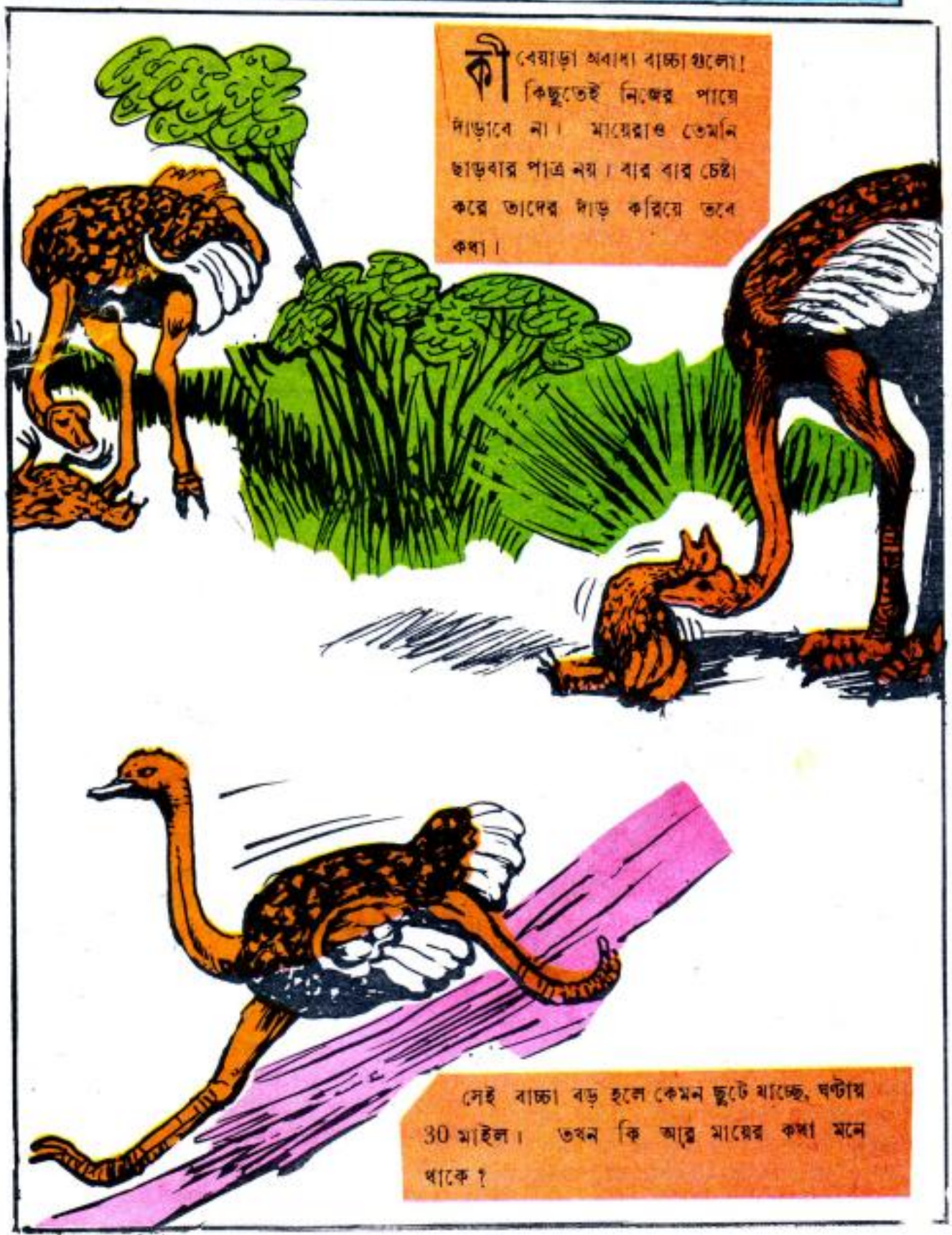

ভাস্কো-দা-গামা ভারতে

ভাস্কো দা-গামা 1460 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ পর্তুগালের Sines-এ জন্মেছিলেন। এর চেয়ে খুব একটা বেশি জানা যায় না তাঁর ছোটবে · সম্পর্কে। তাঁর বাবার ওপর পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন দায়িত্ব দিয়েছিলেন কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছতে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ভাস্কো-দা-গামার বাবা এবং রাজা দ্বিতীয় জন মারা যান। নতুন রাজা প্রথম ম্যানুয়েল একই আদেশ দিলেন ভাস্কোকে। 1497-এর 8 জুলাই পর্তুগাল থেকে চারটে জাহাজ ছাড়ল। 1498-এর 2 মে তারা পৌঁছল কালিকট (এখন যার নাম কোঝিকোডে), এটি ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে। ভাস্কো-দা-গামা যোগাযোগ করলেন স্থানীয় রাজা জামোরিনের সঙ্গে (রাজাদের এই অঞ্চলে জামোরিন নামেই ডাকা হতো)। কিন্তু মশলাপাতি কিনে ভাস্কো পাড়ি দিলেন লিসবনে। তিনি ভারতে এসেছিলেন দু বারে। শেষবার 1524 সালে, ভাইসরয় হিসেবে। কোচিনে তিনি মারা গেলেন ঐ বছরেই।

ভাস্কো-দা-গামার ফ্ল্যাগশিপের নাম ছিল সাও গ্যাব্রিয়েল। প্রায় একশো ফুট লম্বা এই জাহাজ খুব বেশি হলে ঘণ্টায় আট মাইল যেতে পারত। লিসবন থেকে কালিকটের যে 13,000 মাইল সমুদ্রপথের দূরত্ব, তা পেরিয়ে এসেছিল এই জাহাজই।

1499-এ কালিকটের রাজা প্রথম ম্যানুয়েল কে এক চিঠিতে লেখেন 'আপনার দেশের একজন সজ্জন মানুষ ভাস্কো-দা-গামা এসেছেন আমার দেশে। এই ব্যাপারটায় আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার দেশে প্রচুর পরিমাণে দারচিনি, লবঙ্গ, আদা, গোলমরিচ আর মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়। এর বিনিময়ে আমি সোনা, রুপো, প্রবাল এবং টুকটুকে লাল কাপড় চাই।'

আগে পূর্ব দেশগুলির জিনিসপত্র নিয়ে ভারতীয়, আরবী বা পার্সী বণিকেরা আরব সাগর, পারস্য উপসাগর লোহিত সাগর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া এবং অন্যান্য বন্দরে পৌঁছে যেতেন। ভেনিস এবং জেনোয়ার ব্যবসায়ীরা সেইসব জিনিস কিনে ইউরোপে বিক্রি করতেন। এখন পর্তুগালের হাতে সরাসরি সেই ক্ষমতা এসে গেল। এই চেষ্টা অবশ্য চলছিল অনেকদিন ধরেই। 1488 খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ থেকে ফিরে যান। তাঁর জাহাজের নাবিকেরা ভয় পেয়েছিলেন। আর এগনো সম্ভব হলো না।

ভাস্কো-দা-গামার অভিযান :

ভাস্কো-দা-গামা ছিলেন খুব রাশী আর জাঁদরেল নৌ বিশারদ, তাই তাঁর ওপরই ভরসা করেছিলেন পর্তুগালের রাজা। তাঁর চারটি জাহাজের ঘুটি বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরি হয়েছিল বার্থোলোমিউ দিয়াজের তত্ত্বাবধানে। জাহাজে কামান ছিল, আর ছিল তখনকার আধুনিক নৌ অভিযানের সামগ্রী। ভাস্কো-দা-গামার ফ্ল্যাগ শিপ সাও গ্যাব্রিয়েলের দায়িত্বে ছিলেন গনজালো আলভারেস, সাও র‍্যাফায়েলের ক্যাপটেন ছিলেন ভাস্কো-দা-গামার ভাই পাউলো। বেরিওর দায়িত্বে কোয়েল হো। চার নম্বর জাহাজটিতে ছিল অতিরিক্ত মালপত্তর। তার দায়িত্বে গনজালো নুনেস। 118 থেকে 170 জন নাবিক লাগবে অভিযানে, এমন একটা হিসেব করেছিলেন ভাস্কো।

কেপ ভার্দে দ্বীপে তাঁরা পৌঁছলেন আগস্টের তিন তারিখে। সেখানে তিন মাস কাটিয়ে আবার ভেসে যাওয়া। 4 নভেম্বর তাঁরা পৌঁছলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে।

চারদিন পর জাহাজ নোঙর করল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে, কেপ অফ গুড হোপ থেকে যা 125 মাইল উত্তরে।

আবার যাত্রা। নভেম্বর 18 তারিখে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পেরিয়ে সেখানে পৌঁছল জাহাজ। 25 নভেম্বর পৌঁছলেন মোজেল উপসাগরে। কয়েকদিন পর তাঁরা পৌঁছলেন নাটাল—নামটি ভাস্কো-দা-গামারই দেওয়া। 25 জানুয়ারি জাহাজ পৌঁছল মোজাম্বিকের উপকূলে। 28 ফেব্রুয়ারি মোজাম্বিকের একটি দ্বীপ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন পর্তুগীজ নাবিকেরা। তাঁরা বুঝতে পারলেন আরব-নিয়ন্ত্রিত সমুদ্রপথে পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

11 মার্চ ভাস্কো-দা-গামা ভেসে চললেন উত্তরে। কিন্তু

প্রবল স্রোত তাঁর জাহাজকে ঠেলে পিছিয়ে দিল। তিনি বাধ্য হলেন মোজাম্বিকে আরও সপ্তাহ জাহাজ নোঙর করে রাখতে। অনুকূল বাতাসের প্রতীক্ষায় থাকা। 29 মার্চ পর্তুগীজ কামান থেকে ছোঁড়া হল গোলা আর গোলা....।

7 এপ্রিল আরব নাবিকদের সাহায্য নিয়ে জাহাজ পেঁছিল কেনিয়া উপকূলের মোম্বাসায়।

14 এপ্রিল জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-দা-গামা পেঁছিলেন মালিন্দিতে। আফ্রিকার উপকূলে এটাই শেষ বন্দর। তিনি এখানে থেকে গেলেন 9 দিন।

পর্তুগীজরা বরাবরই বন্দরে বন্দরে বিদেশীদের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। এক বন্দরে পেঁছে তাঁরা দেখেছিলেন চারটে জাহাজ। তার মাঝি-মাল্লা, ক্যাপটেন, সবই হিন্দু। হিন্দুরা ভাস্কো-দা-গামার জাহাজে মেরির কোলে যীশুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল কৃষ্ণ বলে—এমনও আছে গল্প-কাহিনীতে।

তারপর ভারতবর্ষ।

মশলা, মণি-মাণিক্য আর গল্প উপকথার দেশ ভারতবর্ষে পেঁছিলেন ভাস্কো-দা-গামা। বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো।

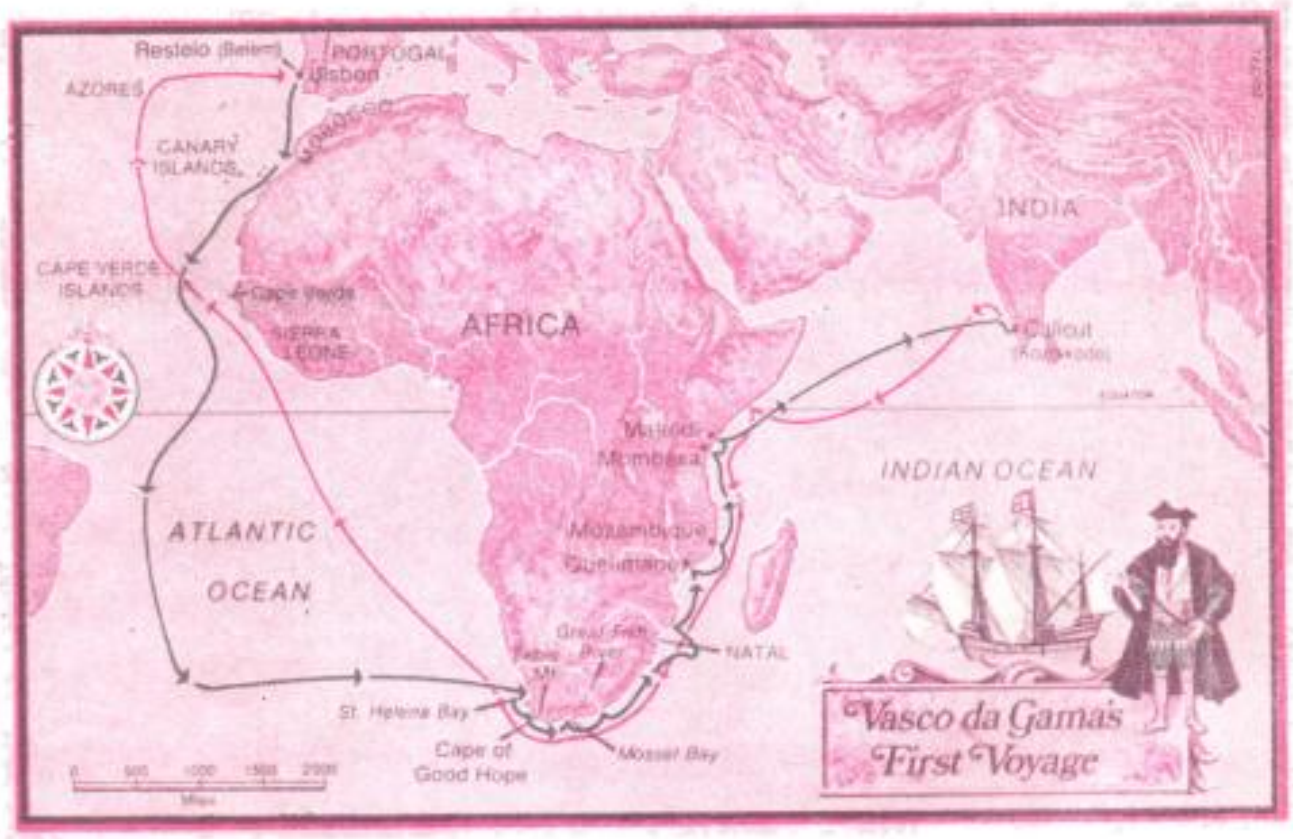

ভাস্কো–দা–গামার কামান

আরবদের হাত থেকে পূর্ব দেশ এবং ইউরোপের মধ্যেকার বাণিজ্যপথ ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে পর্তুগীজদের কিছু কিছু লড়াই তো করতেই হয়েছে। প্রায় প্রথম থেকেই আরব ব্যবসাদাররা চেষ্টা করেছে পর্তুগীজদের থামানোর জন্যে। ১৫০২ সালে ভাস্কো-দা-গামা এই জলপথ কব্জা করার নৌযুদ্ধে প্রথম হারিয়ে দিলেন আরবদের। তার আগে টুকটাক কামেলা হয়েছে। এখানে যে কামানের ছবি, সেরকম কামানই ব্যবহার করত পর্তুগীজরা। ঢালাই লোহা থেকে তৈরি এই হালকা ব্রিচ লোডেড কামান কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধা থাকত লোহার পাত দিয়ে। এরকম গড়ন হওয়ার জন্যে কামান থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাত ক্ষমতা ও দূরত্ব ছিল সীমিত। গরম হয়ে গেলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই কামান দিয়েই ভারি ভারি সশস্ত্র আরব জাহাজ কাত করে দিত পর্তুগীজরা।

কিন্নর রায়

সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট

মান : IX—X August 1986

1. পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ কোনটি ?
2. হিমালয় কোন্ জাতীয় পর্বত ?
3. অ্যাসিডের মধ্যে কোন্ মৌল থাকা অপরিহার্য ?
4. প্রতিটি লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ুষ্কাল কতো ?
5. স্কার্ভি রোগ হয় কোন্ ভিটামিনের অভাবে ?
6. এম. কে এস. পদ্ধতিতে বলের পরম একক কি ?
7. সমতল দর্পণে নিচের কোন্ অক্ষরটির পার্শ্বীয় পরিবর্তন হবে না ?
   (ক) D (খ) F (গ) M
8. নিচের কোনটি ত্রিযোজী মূলক ?
   (ক) NH_4 (খ) SO_3 (গ) PO_4
9. ক্রিকেট খেলায় 'নো-বলে' কতো রান হয় ?
10. বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান কোনটি ?
11. 'ভারতবাসীদের জন্য ভারতবর্ষ"—এই মত প্রচার করেন কে ?

June 1986-এ প্রকাশিত
সিনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট এর সমাধান।

1. তক্ষশিলার। 2. বিপিনচন্দ্র পাল।
3. উত্তর প্রদেশে। 4. আলোয়।
5. ডাই পেপ্টাইড। 6. ন্যানোমিটার একক।
7. অ্যাপেনডিক্স।
8. ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণে।
9. 2 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড।
10. 32 ফিট।

JUNE '86 এর
ফটো কুইজের সমাধান

কুর্চিগাছের পাতা ও ফুল।

কাঠিপোকা।

ফোটো ক্যুইজ

ছবিটির সঠিক পরিচয় কি ?

পদার্থ বিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

পদার্থের আর একটি সাধারণ ধর্ম হলো মহাকর্ষ। সমগ্র বস্তু জগৎই মহাকর্ষ বন্ধনে আবদ্ধ। এ আকর্ষণ সর্বব্যাপী। মহাকর্ষের টান শত্রুমিত্র বিচার করে না। এ আকর্ষণ সকলের প্রতি সকলের আকর্ষণ। এ আকর্ষণে ইঁদুর টানে বেড়ালকে, মেষশাবক টানে বাঘকে। সৌভাগ্যের কথা, ইঁদুর বেড়ালের বা ভেড়া-বাঘের পারস্পরিক টান তেমন জোরালো নয়। তাই ইঁদুরেরা এবং মেষশাবকেরা আজো টিকে আছে।

পদার্থের এই সার্বজনীন মহাকর্ষ বলের অস্তিত্বের কথা প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল, কিন্তু এই মহাকর্ষের স্বরূপ প্রথম বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়েছেন বিজ্ঞানী নিউটন। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির গতির এবং পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের গতির প্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়েই নিউটন মহাকর্ষ বলের অস্তিত্বের আভাস পান। নিউটন যখন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র 24 বছর। 1665 সালে ইংল্যাণ্ডে মহামারীর আকারে প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল। এ রোগে সেসময় লণ্ডনের শতকরা দশভাগ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কেম্ব্রিজেও হয়তো এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে এ আশঙ্কায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ট্রিনিটি কলেজের স্নাতক নিউটন এ সময় কেম্ব্রিজ ছেড়ে চলে যান তাঁর গ্রামের বাড়িতে। উলস্‌থর্প গ্রামের নিভৃত পরিবেশে বসে এই সময় নিউটন বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন।—মহাকর্ষ সূত্র সেগুলোর অন্যতম। এ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী চালু আছে, নিউটন নাকি একদিন তাঁদের ফলের বাগানে বসে একটি আপেল পড়তে দেখেছিলেন এবং পতনশীল আপেলটি দেখেই নাকি নিউটন মহাকর্ষ সূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। অনেকে আবার এমন কথাও বলেন যে, ভাগ্যক্রমে আপেলটা সময়মতো পড়েছিল, না হলে মহাকর্ষ সূত্র অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তেমন নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্যে বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা থাকে, একনিষ্ঠ গবেষণা থাকে। গাছ থেকে আপেল খসে পড়ার মতো আবিষ্কার ঝুপ্‌ করে এসে পড়ে না বিজ্ঞানীদের সামনে।

নিউটন কেমন করে মহাকর্ষ সূত্রে উপনীত হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়; তবে নিউটন কীভাবে এই মহাকর্ষ সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

নিউটনের প্রথম সূত্র অনুসারে, কোন বস্তুর ওপর বল ক্রিয়া না করলে বস্তুটি সমবেগে সরল রেখা বরাবর চলে। কিন্তু সৌরজগতের গ্রহগুলো সরলরেখা ধরে চলে না, উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিভ্রমণ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রহগুলোর ওপর বল ক্রিয়া করছে—না হলে গ্রহগুলো সরলরেখা বরাবর চলতো উপবৃত্তাকার পথে চলতো না। একটি পাথরকে সুতো দিয়ে বেঁধে বৃত্তাকার পথে ঘোরালে দেখা যায় যে, সুতোয় টান পড়ছে। বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল সুতোর টানেই পাথরটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারে। গ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—কাজেই সূর্যের অভিমুখে গ্রহ-গুলোর ওপর একটি বল ক্রিয়া করে একথা ধরে নিতে হয়। চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কাজেই, একই যুক্তিতে ধরে নিতে হয় যে, পৃথিবী চাঁদকে টানছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যে, প্রতিটি বলেরই সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। সুতরাং, সূর্য যদি গ্রহকে টানে তবে গ্রহও সূর্যকে সমান বলে টানবে। আবার, পৃথিবী যদি চাঁদকে টানে তবে চাঁদও পৃথিবীকে সমান বলে টানবে। নিউটনের সমসাময়িক আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এ পর্যন্ত বুঝতেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, সূর্যের আকর্ষণেই গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু সূর্য ও গ্রহের পারস্পরিক বলের স্বরূপ কী এবং দূরত্বের সঙ্গে এই বল কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা তাঁদের জানা ছিল না। তবে, দূরত্বের সঙ্গে এ বল কী নিয়মে বদলাবে তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় সূত্রাদি কিন্তু তখন বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। সেগুলো হল গ্রহের গতি সম্পর্কিত কেপলারের সূত্রাবলী। বিজ্ঞানীরা জানতেন, গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। এই সূত্র থেকেই কিন্তু মহাকর্ষ সূত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানী নিউটন এ সূত্র ধরেই মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন 1665 খ্রিস্টাব্দে। নিউটন অবশ্য তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তখনই প্রকাশ করেন নি।

নিউটনের এ আবিষ্কারের 16 বছর পরের কথা। বিজ্ঞানী এডমাণ্ড হ্যালী, রবার্ট হুক এবং ক্রিস্টোফার রেন একদিন একটি কফি হাউসে বসে গ্রহগুলোর উপর সূর্যের আকর্ষণের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বিজ্ঞানী হ্যালী অন্য দুই বিজ্ঞানীর কাছে প্রশ্ন রেখে-ছিলেন 'গ্রহ ও সূর্যের পারস্পরিক বল দূরত্বের সঙ্গে কী নিয়মে বদলালে গ্রহগুলোর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হবে?' এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তখনো কারো জানা ছিল না।

ক্রিস্টোফার রেন তখন এডমান্ড হ্যালী এবং রবার্ট হুককে বলেছিলেন, 'দু' মাসের মধ্যে যে এই প্রশ্নের সমাধান করে দিতে পারবে তাকে পঞ্চাশ শিলিং দামের একটি বই উপহার দেব।'

এডমান্ড হ্যালী কেপলারের সূত্রগুলো বিচার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রহের ওপর সূর্যের টান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে বদলায়। কিন্তু সূর্য ও গ্রহের পারস্পরিক বলের ক্ষেত্রে ব্যস্তানুপাত বর্গ সূত্র প্রযোজ্য ধরে নিলে যে গ্রহগুলোর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হবে হ্যালী তা প্রমাণ করতে পারলেন না। সেদিন কফি হাউসে ক্রিস্টোফার রেন-এর প্রশ্নটি সমাধান করে দেবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক এবং গর্ব করে বলেছিলেন 'সমাধানটা আমার জানাই আছে, শুধু গুছিয়ে নিয়ে ফেলাটাই বাকি।' তিনজন বিজ্ঞানীই সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই কেউই সমস্যাটির সমাধান করে উঠতে পারলেন না। এডমান্ড হ্যালীর তখন মনে হল নিউটনের কথা।

1682 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এডমান্ড হ্যালী নিউটনের সঙ্গে দেখা করতে কেম্ব্রিজ এলেন এবং নিউটনকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, গ্রহের ওপর সূর্যের আকর্ষণ বল যদি দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় তবে গ্রহের কক্ষপথ কী রকম হবে?'

নিউটন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'উপবৃত্তাকার।'

হ্যালী জানতে চাইলেন, কিন্তু কীভাবে আপনি এ সিদ্ধান্তে আসছেন? নিউটন—'আমি অঙ্ক কষে দেখেছি।'

শুনে হ্যালী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং নিউটনের কাছে সমাধানটি দেখতে চাইলেন। নিউটন বললেন, 'কাগজপত্র খুঁজে দেখতে হবে।'

কাগজপত্র খুঁজে অবশ্য কিছুই পাওয়া গেল না। নিউটন তখন তরুণ বিজ্ঞানী হ্যালীকে আশ্বাস দিলেন, 'চিন্তার কিছু নেই। আমি নতুন করে অঙ্কটা কষে তোমার লণ্ডনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

নিউটন তাঁর কথা রেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই হ্যালীর কাছে পৌঁছে গেল গ্রহের কক্ষপথের প্রকৃতি সম্পর্কে নিউটনের সমাধান। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হ্যালী। সেই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন নিউটনের বিচিত্র স্বভাবের কথা! এমন যুগান্তকারী আবিষ্কারও কেউ প্রকাশ না করে নির্বিকার বসে থাকতে পারে? হ্যালী স্থির করলেন নিউটনের গবেষণালব্ধ ফলাফল গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। এর পর প্রধানত হ্যালীর আগ্রহে এবং আনুকূল্যে নিউটনের বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছু মজাদার সমীকরণ

সজল চক্রবর্তী

তোমরা সকলেই জানো যে, $1+2=3$। এখানে 3টি ক্রমিক অঙ্ক ক্রমানুযায়ী ব্যবহার করে সমীকরণটি তৈরি করা হয়েছে। এবার আমরা এরূপ কতগুলো মজাদার সমীকরণ তৈরি করব 1 থেকে 9 পর্যন্ত ব্যবহার ক'রে। তোমরাও আরও কিছু সমীকরণ বের করার চেষ্টা করবে; তবে একটা শর্ত মেনে—শর্তটা হল :—

প্রত্যেক অঙ্ক একবারই ব্যবহার করবে এবং ক্রমানুযায়ী ব্যবহার করবে, যেমন $2+1=3$ লিখবে না, কেননা 2, 1, 3 ক্রমানুযায়ী নয় বরং 1, 2, 3 ক্রমানুযায়ী সুতরাং $1+2=3$ লিখবে। এবং এই সমীকরণে তুমি যে কোনো চিহ্ন বা প্রক্রিয়া [+, −, ×, L] ব্যবহার করতে পারবে।

এখন আমি কিছু সমীকরণ করে দেখাচ্ছি :—

$$1+2=3$$

$$12=3\times 4$$

$$12=3+4+5$$

$$12+3=4+5+6$$

$$-1+23=4+5+6+7$$

$$1-2+3^4=5+67+8$$

$$(1+2)3+4+5+6=7+8+9$$

এরূপ আরো সমীকরণ তৈরি করা যায়, যেমন $(1+2)3=4+5$. কিন্তু আমি বের করছি না। তোমাদের জন্য রেখে দিলাম। তোমরা নিজেরা বের কর এবং মজা উপভোগ করার চেষ্টা কর।

3K, নস্করপাড়া লেন, কলকাতা-31

বাষ্পমোচন

দিনোজ কুমার দে

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে আমরা বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ দেখি। সংখ্যায় যেমন তারা অগণিত তেমনি তাদের গঠন বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। উদ্ভিদের এই আকৃতি, প্রকৃতি বা গঠন বৈচিত্র্যের কারণ এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিবর্তনশীল পরিবেশ। একই পরিবেশ কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অনুকূল আবার কারো বা প্রতিকূল। এই অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য প্রতিটি উদ্ভিদ অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ক্যাকটাসের কথা। তোমরা ক্যাকটাস প্রায় প্রত্যেকেই দেখেছো। তোমরা দেখেছো ক্যাকটাসের দেহ স্থূল ও শাঁসালো এবং দেহত্বক কৃত্তিকাবরণীযুক্ত। তাছাড়া ক্যাকটাসের পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম। যে কটি থাকে সেগুলোও আবার পাতার ভিতরে থাকে। এ ছাড়াও ক্যাকটাসের পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের আকারও খুব ছোট। ক্যাকটাসের এই রকম অঙ্গস্থানিক ও শারীরস্থানিক পরিবর্তনের কারণ কেবলমাত্র জল সংরক্ষণ ও বাষ্পমোচন হ্রাসের জন্য।

এখন তোমাদের জানা প্রয়োজন বাষ্পমোচন প্রক্রিয়াটি কি? তোমরা জান উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈবনিক কার্য করবার জন্য খনিজ লবনের প্রয়োজন। এই খনিজ লবন মাটি হতে সংগ্রহ করে। কিন্তু মাটিমধ্যস্থ জলে খনিজ লবনের পরিমাণ খুবই কম। তাই খনিজ লবনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য উদ্ভিদকে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করতে হয়। কিন্তু উদ্ভিদ যে পরিমাণ জল শোষণ করে তার মাত্র 5% শারীরবৃত্তীয় কার্যের জন্য দরকার। বাকি 95% উদ্বৃত্ত জল উদ্ভিদ বাষ্পাকারে দেহ থেকে ত্যাগ করে। এই শোষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলকে বাষ্পাকারে উদ্ভিদের দেহ হতে পরিত্যাগ করার পদ্ধতিকে বলা হয় বাষ্পমোচন। স্থলজ উদ্ভিদদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে বাষ্পমোচন অন্যতম ও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

আপাতঃদৃষ্টিতে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হবে বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন একই প্রক্রিয়া। কিন্তু তা নয়। বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটি প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া কিন্তু বাষ্পীভবন একটি ভৌত প্রক্রিয়া। তাছাড়া বাষ্পমোচন কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদ্ভিদের বাষ্পমোচন তিন প্রকার। যথা পত্ররন্ধ্রীয়, ত্বকীয় এবং লেন্টিসেলীয়। পত্ররন্ধ্রীয় অর্থাৎ যখন পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়। উদ্ভিদের পাতার উপর ও নিম্নপৃষ্ঠে যে ছিদ্রগুলি থাকে সেগুলিকে বলা হয় পত্ররন্ধ্র। এই পত্ররন্ধ্রগুলি পত্ররন্ধ্র ছিদ্র ও রক্ষী কোষ দ্বারা গঠিত। এবং এই রক্ষীকোষগুলি পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র খোলা বা বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করে। পত্ররন্ধ্রগুলি রাত্রিতে বন্ধ থাকে। কেবল মাত্র দিনের বেলা খোলা থাকে। তাই পত্ররন্ধ্র দ্বারা কেবলমাত্র দিনের বেলায় বাষ্পমোচন হয়। পত্ররন্ধ্র দ্বারাই সবচেয়ে বেশি বাষ্পমোচন হয়। এই পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাষ্পমোচনের প্রায় 90% হয়ে থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য পাতার ত্বকের বাইরে এক প্রকার মোমজাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে। কিন্তু এই আবরণ যদি পাতলা হয় অথবা আবরণের মাঝে যদি ফাটল থাকে তাহলে সেই অংশ দিয়েও বাষ্পমোচন হয়। এই ধরনের বাষ্পমোচনকে বলা হয় ত্বকীয় বাষ্পমোচন। ত্বকীয় বাষ্পমোচন সমগ্র বাষ্পমোচনের প্রায় 10% থেকে 15% হয়ে থাকে। এই ধরনের বাষ্পমোচন বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ত্বকীয় বাষ্পমোচন দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই হয়ে থাকে। আবার গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখায় প্রচুর ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রগুলিকে বলা হয় লেন্টিসেল। এই ছিদ্রগুলোর মাধ্যমেও খুব সামান্য পরিমাণ জল উদ্ভিদের দেহ থেকে বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। এই ধরনের বাষ্পমোচনকে বলা হয় লেন্টিসেলীয় বাষ্পমোচন। এই প্রকার বাষ্পমোচনের দ্বারা মাত্র 0·1% জল উদ্ভিদের দেহ থেকে বাইরে যায়। এবং এই প্রকার বাষ্পমোচন দিনের বেলা ও রাত্রিতে উভয় সময়ই হয়ে থাকে।

তোমরা জান পত্ররন্ধ্রীয় বাষ্পমোচন কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয়। রাত্রে হয় না, কারণ রাত্রে পত্ররন্ধ্র বা পাতার ছিদ্রগুলি বন্ধ থাকে। কিন্তু কিভাবে দিবালোকে পত্ররন্ধ্রগুলি উন্মোচিত হয়, সেটা তোমাদের জানা উচিত। প্রতিটি পত্ররন্ধ্র দুটি রক্ষীকোষ দ্বারা গঠিত। রক্ষীকোষগুলি আনুষঙ্গিক ত্বক কোষ দ্বারা পরিবৃত থাকে। রক্ষীকোষগুলির কোষপ্রাচীর দুদিকে দুরকম। অর্থাৎ আনুষঙ্গিক কোষের দিকে রক্ষীকোষের কোষ প্রাচীর পাতলা এবং বিপরীত দিকে বা ছিদ্রের দিকে পুরু। পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র খোলা রক্ষীকোষ দুটির রসস্ফীতির দ্বারা হয়ে থাকে। রক্ষীকোষগুলির উপর সূর্যালোক পড়লে রক্ষীকোষের অভিস্রবণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে আনুষঙ্গিক কোষ থেকে জল অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। এবং রক্ষীকোষে রসস্ফীতি দেখা দেয়। রক্ষীকোষ আয়তনে বাড়ে। আয়তনে বাড়ে অর্থাৎ রক্ষীকোষের কোষপ্রাচীর আনুষঙ্গিক কোষের দিকে পাতলা বলে ঐ

- আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
- আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
- আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

দিকে বেশি বাড়ে ফলে ঐ দিকে উত্তল হয়ে পড়ে। ঠিক ঐ সময়ই বিপরীত দিকে রক্ষীকোষের কোষপ্রাচীর অবতল হয়ে পড়ে। দুটি রক্ষীকোষের ভিতরের দিকে কোষ প্রাচীর অবতল হয়ে পড়ার অর্থ একটি ছিদ্র বা ফাঁকের সৃষ্টি। এই ফাঁক বা ছিদ্র দিয়েই উদ্ভিদ দেহে অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। তোমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যখন রক্ষীকোষের রসস্ফীতি দেখা দেয় ঠিক তখন আনুষঙ্গিক কোষে রসশিথিলতা দেখা যায়।

বিজ্ঞানী লফটফিল্ড (Loltfield) এর মতে স্টোমাটা বা পত্ররন্ধ্র তিনপ্রকার। ছোলা, মটর, আপেল প্রভৃতি উদ্ভিদের স্টোমাটাকে বলা হয় আলফা টাইপ। এই ধরনের পত্ররন্ধ্রের ছিদ্র সারাদিন খোলা থাকে। কিন্তু অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। বাঁধা কপির স্টোমাটাকে বলা হয় পটেটো টাইপ। এই ধরনের স্টোমাটার ছিদ্র প্রায় সারাদিন রাত খোলা থাকে কেবল সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা ছাড়া। আর বার্লি টাইপ পত্ররন্ধ্র দেখা যায় গম, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদে। এই ধরনের পত্ররন্ধ্রের মুখ দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টা খোলা থাকে। তারপর সারা দিন রাত বন্ধ থাকে। আবার ইক্যুইজিটামের পত্ররন্ধ্রের মুখ সবসময়ই খোলা, কখনও বন্ধ থাকে না।

বাষ্পমোচন কয়েকটি শর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন আলো, উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, মাটিতে জলের পরিমাণ ইত্যাদি। আবার স্টোমাটার সংখ্যা কম না বেশি, পাতার গঠন এমনকি মেসোফিল কলায় জলের পরিমাণের উপরও বাষ্পমোচন নির্ভর করে।

উদ্ভিদের বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে উদ্ভিদের জীবনে বাষ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী একমত পোষণ করেন না। কোন কোন বিজ্ঞানী বলে থাকেন বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য দুষ্কৃতি (Necessary and Unavoidable evil)।" কারণ তাঁরা বলেন, উদ্ভিদ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় 95% অতিরিক্ত জল শোষণ করে। এর ফলে উদ্ভিদের যে শক্তি ব্যয় হয় সেই শক্তি-দ্বারা উদ্ভিদ অন্যান্য জৈবনিক কার্য করতে পারত। তাছাড়া দ্রুত বাষ্পমোচনের জন্য অনেক উদ্ভিদ মারা পর্যন্ত যায়। কিন্তু বাষ্পমোচন উদ্ভিদের অনেক উপকার পর্যন্ত করে। বাষ্প-মোচনের জলের সঙ্গে উদ্ভিদদেহের কিছু তাপ বের হয়ে যায়। ফলে উদ্ভিদের দেহ ঠান্ডা বা শীতল হয়। বাষ্প-মোচন উদ্ভিদের অভিস্রবণে সাহায্য করে। বাষ্পমোচন উদ্ভিদের অজৈব লবন শোষণে সাহায্য করে। সুতরাং বাষ্পমোচন উদ্ভিদের যেমন ক্ষতিও করে তেমনি উপকারও করে অনেক।

পোঃ পাইটা, বর্ধমান।

বিশেষ রচনা

সাগর মাঝে ত্রাণ ও উদ্ধার

মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সংযোগ সভ্যতার সেই আদিমকাল থেকেই চলে আসছে। দেশ দেশান্তরে পসরা প্রেরণের অভিপ্রায়ে মানুষ যেমন ভেসে বেড়িয়েছে উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝে, তেমনই সে অবিরামভাবে প্রয়াস চালিয়েছে সাগরের বুক থেকে সম্পদ আহরণের অভিলাষে। সাগরকে নিয়ে বহুমুখী মানুষের প্রচেষ্টা। একদিকে যেমন দেখি জলধির দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি থেকে মানব কল্যাণের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবনে বিজ্ঞানের নব নব দান, অন্যদিকে, পয়োধির নীল জলে নিজের যাত্রাপথ নিরাপদ করার অভিলাষে পারাপারের তরীসমূহের পরিমার্জনায় সে স্বতঃই লিপ্ত। তবু নিজের মুঠোর মধ্যে সাগর আর আসে না। সে তার খেয়ালখুশি মত বয়ে চলে কাউকে তোয়াক্কা না করে। কোন কোন অশুভ ক্ষণে আদিগন্ত জলোচ্ছ্বাসের রুদ্র প্রকোপে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুক্ষ্ম সব ব্যবস্থা সদ্যোজাত শিশুর মত অসহায় হয়ে যায়। দুর্জয়ী সংগ্রামী শক্তি মানুষকে প্ররোচিত করে ঠেকে শিখতে। নতি স্বীকারে সে অপারগ। সেটাই তার বল। তাই সে নিজের কাছেই দাবি জানায়—চাই আরও উন্নত ব্যবস্থা। আরও, আরও।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাগরের জলে পরিক্রমণে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কতটা অগ্রগতি হয়েছে। এ প্রশ্ন জবাব দেবার আগে জেনে নেওয়া দরকার সমুদ্রে মানুষের বিপদ কিভাবে বা কতভাবে আসতে পারে। জাহাজ ডুবীর প্রসঙ্গ সবচেয়ে প্রথমে এসে পড়ে। জাহাজ যখন জলে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন ডুবন্ত জাহাজের প্রায় সব যাত্রীই আশ্রয় নেয় লাইফবোটে বা লাইফ র‍্যাফ্‌টে। প্লেনের যাত্রীদের থেকে বিপদের মুখে জাহাজযাত্রীদের উদ্ধার পাওয়ার প্রস্তুতি পর্বের আয়োজনের সময় বেশ কিছু মেলে। তবু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে লাইফ বোটে ভাসমান যাত্রীর নিরাপত্তা অনেক সময়ই বিপন্ন হতে পারে। জাহাজে অগ্নিসংযোগের প্রচুর বিবরণ জানতে পারা যায়। চতুষ্পার্শে জল পরিবেষ্টিত হয়েও বিধ্বংসী অগ্নির লেলিহান শিখায় অনেক জাহাজেরই ক্ষতির পরিমাণ বিশাল।

সারা পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রতটের বহু অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা মৎস্য শিকার। জেলে বা জেলের ডিঙি সমুদ্রে অবলুপ্ত—এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় মৎস্য শিকারের তরী (ফিসিং ট্রলার) তীর থেকে সমুদ্রের অনেক ভেতরে প্রবেশ করে। এই সব ট্রলারদের মাঝ সমুদ্রে উল্টে যাবার দৃষ্টান্তও অনেক।

সমুদ্র মাঝে একমাত্র 'অসুখ' যা সুখের বলে বিবেচিত হয় তা হল সন্তানের জন্মদান। এ ছাড়া অন্য যে কোন ব্যাধিই চিন্তার উদ্রেক করে। সমুদ্রে যাত্রাপথে নাবিক বা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন অবিলম্বে চিকিৎসা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের উপস্থিতি জাহাজে নাও থাকতে পারে। ডাক্তার থাকলেও অনেক সময় শল্য চিকিৎসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। মাঝ দরিয়ায় যাত্রীর হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা যেমন বাতিল করা যায় না, তেমনই এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের প্রচণ্ড ব্যথার উদ্ভব হওয়া সম্ভাব্যের তালিকাভুক্ত হতে পারে। দোলায়মান জাহাজে এক্ষেত্রে অপারেশন করা যে একান্তই অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। এইসব বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হলে তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়, তা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সাগরজলে ত্রাণের প্রচেষ্টায় প্রথম প্রয়াসী দেশ চীন। তারা 1737 সালে সমুদ্রতটে জীবনরক্ষা সংস্থা স্থাপন করে। এরপর হল্যাণ্ডে ও তার অল্প পরে ইংল্যাণ্ডে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। 1786 সালে এ ধরনের যে সংস্থার আবির্ভাব ঘটে আমেরিকায় তার নাম ম্যাসাচুসেটস্ হিউম্যান সোসাইটি। এই সবকটি সমিতিই বেসরকারী। সমুদ্রতটে এদের স্টেশন থাকত। কোন নৌকা বা জাহাজডুবীর খবর এসে পৌঁছলে সেখানে সতর্কধ্বনি বেজে উঠত। অবিলম্বেই ঘটনাস্থলের দিকে ধাবিত হত লাইফবোট আরোহিত পরার্থপর ব্যক্তিরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়ে উদ্ধারের নিমিত্ত যাত্রীবাহী নৌকাগুলো বিপদের সম্মুখীন হত। এদের মধ্যে অনেকেই আর তীরে ফিরে আসেনি। তবুও বিপদে সাড়া দিতে লোকের অভাব কখনো হয়নি। এছাড়া তীরের কিছু দূরে দূরে অসংখ্য কুটীর নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে পরিচ্ছদ, খাদ্য ও জ্বালানী মজুত থাকত। ডুবন্ত জাহাজের ভাসমান নাবিক কোন রকমে ভাসতে ভাসতে তীর স্পর্শ করে এইসব কুটীরে অনিশ্চয়তার হাত থেকে স্বস্তি পেত। অবশ্য এই জাতীয় সংস্থার কার্যকলাপ মূলতঃ তীরেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ব্রিটেনে আজও ন্যাশানাল লাইফবোট অ্যাসোসিয়েশান্ নামে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বর্তমান।

অনেক বিবর্তনের পর সাগরের জলে রক্ষা করার দায়িত্ব আজ সমুদ্রতীরবর্তী দেশের উপকূল রক্ষীবাহিনীর উপর বর্তেছে। এরা নৌসেনারই একটা বিভাগ। এদের মূল দায়িত্ব অবশ্য দেশের জলসীমাকে রক্ষা করা। এই তো কয়েক মাস আগে ভারতীয় উপকূলবাহিনী (কোস্ট গার্ড) শ্রীলঙ্কার গানবোটকে বন্দী করে নিয়ে এল ভারতীয় জলখণ্ডে অনুপ্রবেশের অজুহাতে। জলপথে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের মোকাবিলা করাও এদের অন্যতম দায়িত্ব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের প্রায় দৈনন্দিন কাজ সাগরে সন্ধান ও উদ্ধার। এদের অধীনে থাকে বিভিন্ন রকমের জলতরী, হেলিকপ্টার ও উড়োজাহাজ। এক ধরনের হেলিকপ্টার ও উড়োজাহাজ আছে যা জলে ভেসে থাকতে পারে। এরা উভচর হেলিকপ্টার ও সীপ্লেন বলে অভিহিত। ত্রাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ জলতরীই উচ্চগতিসম্পন্ন। তবু বায়ুযানের চেয়ে জলযানের গতি সব সময়ই কম। কোন নির্দিষ্ট যান ঘটনাস্থলে প্রেরিত হবে তা নির্ভর করে বিপদের গুরুত্ব ও তীর থেকে দূরত্বের উপর। তীর থেকে 300 মাইল দূর অবধি হেলিকপ্টার যেতে পারে। তবে সীপ্লেন আরও অনেক গভীরে যাবার ক্ষমতা রাখে। সাগরে রক্ষা করার ব্যাপারে এরাই আদর্শ। এরা দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধান চালাতে পারে। এদের সাহায্যে এমন সব উদ্ধার কার্য সংঘটিত হয়েছে যা প্রায় গল্পের মত শোনায়।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উড়োজাহাজের পরিক্রমণ আর তা দিয়ে পাথারের অথৈ জলে সন্ধান চালানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী উড়োজাহাজের একদেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেবার পথের উচ্চতা, দিক বা গতি প্রায়ই নির্দিষ্ট থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্করুণ আবহাওয়া প্রতিকূলতার সূত্রপাত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ত্রাণের উদ্দেশ্যে উড়ন্ত সীপ্লেন যে বিপদের ঝুঁকি নেয়, এ তার তুলনায় কিছুই নয়। সমুদ্রের যে বিন্দু তার গন্তব্যস্থল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থিরীকৃত নয়। সমুদ্রের ভেতর একাকীত্বে মানুষের দিশাহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। নৌচালনে ত্রুটির আশংকা হলে জাহাজের ক্যাপ্টেন সব সময়ই গতিকে স্তব্ধ বা স্তিমিত করে সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পান। কিন্তু প্লেনে এ হেন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে পাইলটকে ক্রমাগত প্লেন চালিয়ে যেতে হয়। এর ফলে তার ভুল বেড়ে যাওয়ার আশংকাই থাকে তাই নয়, তার জ্বালানীর পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। কম্পাসে ডিগ্রীর ভুল হলে একটা জাহাজ তার নির্দিষ্ট নিশানা থেকে মাত্র কয়েক মাইল ভ্রান্তপথে অপসারিত হতে পারে। কিন্তু অনুরূপ ত্রুটিতে একটা প্লেনের ভ্রান্তির পরিমাপ প্রতি ঘণ্টায় একশ মাইলের বেশি হতে পারে যদি সে বাতাসের গতিকে অবহেলা করে। তাছাড়া জাহাজে নোঙর করার ব্যবস্থা আছে। আকাশে আর প্লেনকে কে ধরে রাখবে! তাই সীপ্লেনের পাইলট জীবনমরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে উদ্ধারকার্য চালিয়ে থাকে।

উপকূলরক্ষী বাহিনী ব্যতিরেকে বিপদের মুহূর্তে অন্যভাবে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। যাত্রাপথে কোন জাহাজের সংকটের সংবাদ অন্য কোন জাহাজ প্রাপ্ত হলে, তাকে দুর্ঘটনার স্থলে অগ্রসর হতে হয় অবশ্য সে যদি খুব বেশি দূরে না থাকে, সিন্ধুবুকে পাড়ি দেবার এটা একটা অলিখিত প্রথা। অন্য কোন জাহাজের বিপত্তির সাইরেন অন্য জাহাজের ব্রীজে 500 কিলোসাইকেলে বেজে উঠে। জাহাজের রেডিও মারফৎ তা ধরা পড়ে। বিপদগ্রস্ত জাহাজের অবস্থানের সঠিক বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে একটাই অসুবিধে, তা হল বিপদের খবর অনেকেই পাবে এবং সকলেই ঘটনাস্থলে যাবার চেষ্টা করবে যেখানে একজনের উপস্থিতিই যথেষ্ট।

অবশ্য কম্পিউটারের যুগে আজকাল এ ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে যদিও তা এখন সীমিত আমেরিকার উপকূলে। নিউ ইয়র্ক বন্দরে প্রত্যেক জাহাজ তার বন্দর পরিত্যাগ করার ক্ষণ ও যাত্রাপথের পরিকল্পনা কোস্ট-গার্ডকে জানিয়ে দেয়। এ তথ্য কম্পিউটারে পরিবেশিত হয় ও তার স্মৃতিতে (মেমরীতে) ধরা থাকে। যখন কোন জাহাজের বিপত্তির সংবাদ কোস্ট গার্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন কম্পিউটারের পর্দায় দেখে নেওয়া হয় ওই সময়ে বিভিন্ন জাহাজের অবস্থিতির চিত্র। সঙ্কটাপন্ন জাহাজের সবচেয়ে নিকটবর্তী জাহাজকেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে বলা হয়। এর ফলে বহু জাহাজের একই স্থানে যাবার আর প্রয়োজন হয় না।

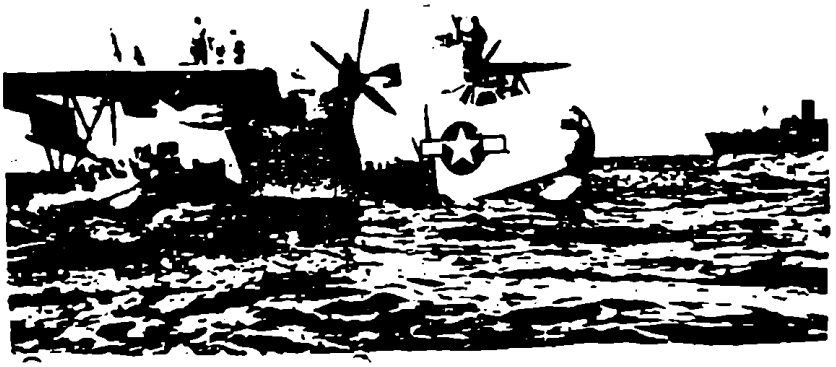

ভাসমান সী-প্লেন

এমন অবস্থারও উদ্ভব হতে পারে যখন সাহায্যকারী জাহাজও বিক্ষুব্ধ অবস্থার মুখোমুখি। বিপদের স্থানে অগ্রসর হওয়া মানে তার নিজের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করা। তখন অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। হয়ত কোস্টগার্ডের এমন কোন জলযান পাঠানো হয় যে ওই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে। কিংবা উড়ে চলে হেলিকপ্টার বা সীপ্লেন। এমনও এক একটা দুঃসময় আসে যখন একসঙ্গে দুতিনজন জাহাজের বিপদের সংবাদ এপকুলে এসে হাজির হয়।

অননুকূল অবস্থার মোকাবিলা করার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেদের অপরিসীম ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। দিনক্ষণ দেখে বিপদ আসে না। দিনের আলোয় তবু কিছু বাড়তি সুযোগ থাকে, কিন্তু রাতের আঁধারে উদ্ধারকার্য সম্পাদন করা মানে সাহায্যকারীর জীবন সূক্ষ্ম সুতোর তারে ঝোলা। আর তা যদি অমাবস্যার সূচিভেদ্য অন্ধকার হয়, তবে তো কথাই নেই। নিশ্ছিদ্র নিশীথে সাগরজলে ত্রাণের অভিলাষে পরিক্রমণ তো যেন জীবনের সেই অন্তিম লগ্নের প্রহর গোনা। হেলিকপ্টারের পাইলটের সামান্য অনবধানতাবশতঃ যদি কোনক্রমে তার রেড জাহাজের মাস্তুল স্পর্শ করে, তবে তার ফলশ্রুতি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সেই বায়ুযানের অন্তরস্থিত সমস্ত লোকের অবধারিত প্রাণনাশ। এসব ত্রাণকার্যে জাহাজকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতে হয় এবং কয়েক চক্রের পর পাইলটের মাথা ঘোরার এক প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—প্রবীণ পাইলট দেখতে পাওয়া যায়, দুঃসাহসী পাইলটকেও দেখা যায়, কিন্তু এমন পাইলট পাওয়া যায় না যে প্রবীণ এবং দুঃসাহসী।

মাঝ সমুদ্রে অসুস্থ হয়ে পড়লে যে জাহাজে ডাক্তার আছে তাকে রোগের উপসর্গ জানানো হয়। বেসরকারী চিকিৎসা সংস্থার জাহাজ থেকেও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। রোগের বিবরণ অনুযায়ী রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। সেইমত ওষুধপথ্যাদির উপদেশ দেওয়া হয়। সে ওষুধ অবশ্য রোগীর জাহাজে লভ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় অন্যথায় রোগীকে তীরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অবশ্য রোগীকে না দেখে রোগ-নিরূপণে চিকিৎসাবিভ্রাটের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একবার এক নাবিকের উপসর্গ অনুযায়ী ডাক্তার মনে করলেন তার একজাতীয় ফুসফুড়িযুক্ত কঠিন সংক্রামক ব্যাধি হয়েছে। তাই অবিলম্বে সীপ্লেন পাঠানো হল যাতে করে তাকে তীরে নিয়ে আসা যায়। যেহেতু অসুখটা অত্যন্ত সংক্রামক বলে চিহ্নিত, তাই প্লেনের যে দুজন পরিচারক রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের তীরে অবতরণের পর সঙ্গরোধ করে রাখা হল দুদিন। সঠিকভাবে রোগ যখন ধরা পড়ল তখন জানা গেল নাবিকের একটা যৌনরোগ হয়েছে এবং

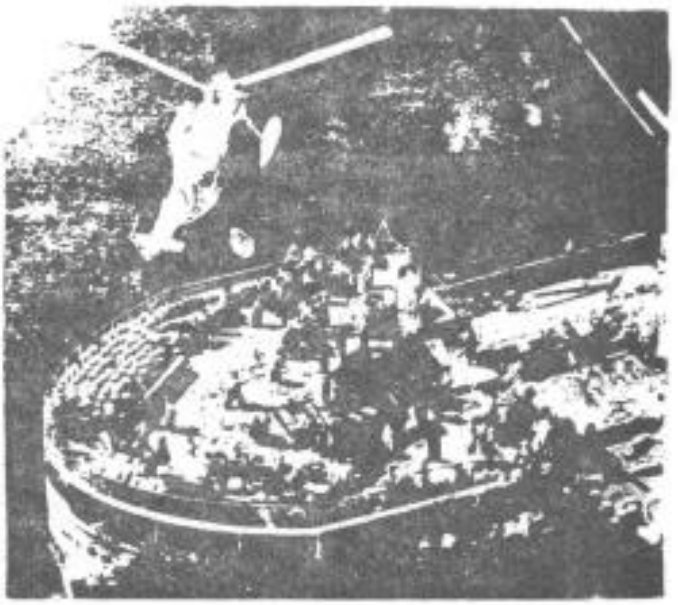

হেলিকপ্টার দ্বারা জাহাজের রেডক থেকে অসুস্থ নাবিক উত্তোলন।

তা প্রাথমিক পর্যায়ে। রোগটা কিন্তু সেরকম সংক্রামক না যার জন্য রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের একেবারে আলাদা করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

মানুষের কৃতঘ্নতার পরিচয় পেয়ে এক ডাক্তারের মন বিষন্ন হয়ে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে এক জেলেকে সাহায্য করার জন্য তিনি সীপ্লেন করে রওনা হয়েছিলেন। জেলের চোখে বড়শী গেঁথে গিয়েছিল। ডাক্তার জেলের কাছে পৌঁছে দেখল যে এক সহৃদয় বন্ধু কর্তৃক বড়শীর সঙ্গে তার চোখ উৎপাটিত! রোগীকে নিয়ে প্লেন তীরে ফিরে এল। অপেক্ষায় জেলের স্ত্রী ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরল কৃতজ্ঞতায়। তার কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ পেল প্লেনের পাইলট। এই ঘটনার বছর খানেক বাদে আদালত থেকে ডাক্তারের কাছে সমন এল যে এক জেলের চোখকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। একান্ত বিমর্ষ হয়ে ডাক্তার চিন্তা করতে লাগল যে উচ্ছলিত তরঙ্গের মাঝে সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জেলেকে উদ্ধার করার জন্য এই তার পুরস্কার! মনের দুঃখে হাজির হল সে সেই প্লেনের পাইলটের কাছে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পাইলট তো হেসেই খুন। আর ততই অবাক হবার পালা ডাক্তারের। হাসতে হাসতে পাইলট জানাল যে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ চোখ নষ্ট হয়ে যাবার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের এটা একটা বাঁধাধরা আইনগত পন্থা, ডাক্তারের উপর অনাস্থাসূচক কিছু না।

সমুদ্রে উদ্ধারের সাধারণ কাজও মাঝে মাঝে কিভাবে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তার একটা ঘটনার উল্লেখ করি। একবার সমুদ্রের আশী মাইল ভেতরে এক জাহাজ থেকে অচৈতন্য

রোগীকে নিয়ে আসার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো হল। হেলিকপ্টার যথাস্থানে এসে উত্তোলকের তলায় শয্যার উপাদান যুক্ত করে জাহাজের উপর নামিয়ে দিল। রেডিও মারফৎ কি করতে হবে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে দেওয়া হল। জাহাজের নাবিকরা শয্যাটা খুলে রোগীকে শুইয়ে দিলে বটে; কিন্তু তাকে শয্যার সঙ্গে বেঁধে দিল না। এই অবস্থায় উত্তোলকের সাহায্যে শয্যাটা যদি উপরে উঠানো হতে থাকে, তা দৈবাৎ উল্টে যাবার সমূহ সম্ভাবনা এবং তাতে রোগীর পতন ও মৃত্যু অনিবার্য। তাই আবার রেডিওর সাহায্যে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হল। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। বোধ হয় সবাই তখন জাহাজের পাটাতনে উপস্থিত উদ্ধারকার্য দেখার অভিপ্রায়ে। হেলিকপ্টার থেকে বহুপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করে এ ব্যাপারে সচেতন করার প্রচেষ্টা চলল, কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে জাহাজের লোকেদের অবহিত করা গেল না। যখন সবরকম চেষ্টাই বিফলে গেল, তখন ভগবানের নাম করে রোগীকে শয্যাসহ উপরে ওঠানো শুরু করা হল। সৌভাগ্যবশতঃ কোন প্রকার ট্রাজেডী ঘটেনি যদিও তার প্রচণ্ড সম্ভাবনা ছিল। যদি অশুভ কিছু ঘটে যেত, তবে সমস্ত দোষ বর্তাতো পাইলট আর তার সহকর্মীদের। তাই সমুদ্রে বিপদ থেকে ত্রাণের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের নায়ক হওয়া ও নিন্দার ভাগী হওয়ার মধ্যে রেখার ব্যবধান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলে ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যে প্রগতির ইঙ্গিত করে তা প্রশংসাই সন্দেহ নেই। তবুও অতি উন্নতপন্থা অবলম্বন করেও সব মানুষের সব সময় প্রাণরক্ষা করা সম্ভবপর নয়। যে ভয়ংকরত্বের সীমা অতিক্রান্ত হলে কয়েক দশক আগেও মানুষ অসহায়বোধ করত, আজ তার সীমা অনেক বিস্তৃত। এই বিস্তৃতিই তো আমাদের সভ্যতা ও জ্ঞানের অগ্রগতির পরিচায়ক।

অধ্যাপক, আই. আই. টি. খড়্গপুর

জীবজন্তু

স্প্যানিশ্ ফ্লাই

সলিল রাহা

ফার্মাসিস্টদের কাছে 'ব্লিস্টার বিটল' নামে খুবই পরিচিত। কারণ এই পতঙ্গের ইলাইট্রা অর্থাৎ সম্মুখস্থ ডানাজোড়া হতে ভেসিক্যাণ্ট কান্থারাইডিন (যার রাসায়নিক ফর্মুলা– $C_{10}H_{12}O_4$) পাওয়া যায় এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কোলেওপটেরা (Coleoptera) বর্গের অন্তর্গত মেলোয়ডি (Meloidae) পরিবারের ইউরোপিয়ান এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম Lytta Vesicatoria (L.)। এই প্রজাতির স্বগোত্রজদের 'অয়েলবিট্‌ল' বলা হয়। বড় আকৃতির, কালো বর্ণের এই বিটলদের দেহ লম্বাটে হয়। এবং 7-20 মিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এদের ইলাইট্রা নরম প্রকৃতির ও ছোট হয়। ফলে উদরের পশ্চাদদিকের অংশ খোলা থাকে। পত্রসমূহ ও পাতলা পর্দার ন্যায় পশ্চাদ ডানাজোড়া ইলাইট্রার নিচে থাকে। পত্রসমূহ ও ফুলের উপর নির্ভর করে এরা বেঁচে থাকে।

এদের জীবন বৃত্তান্তের জটিলতা লক্ষণীয়। হাইপার মেটামরফোসিস্ (Hypermetamorphosis) অর্থাৎ পরপর লার্ভাদশার প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, সদ্যোজাত নিষ্ক্রিয় লার্ভা ট্রাইঅ্যাংগুলি (Triangulin), দ্বিতীয় দশার লার্ভা ক্যারাবয়েড (Caraboid), তৃতীয় দশার লার্ভা স্কারাবয়েড, চতুর্থ ও পঞ্চম দশার লার্ভা বেশ মোটা হয়। ষষ্ঠ দশার লার্ভায় কার্যকরী উপাঙ্গ না থাকায় সিউডোপোডিয়া, অথবা কোয়ার্কটেট (Quarctate) নামে অভিহিত। সপ্তম দশার লার্ভা ছোট, সাদা বর্ণের এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পিউপায় পরিণত হয়। পিউপা পরবর্তীকালে বিটল-এ রূপান্তরিত হয়। লার্ভার প্রতিটি দশায় খোলস ত্যাগ হয়। বিচিত্র এই জীবন বৃত্তান্তের আর একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করার মত। লার্ভার প্রথম দশা হতেই মৌমাছির বাসাতেই মধু খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। সদ্যোজাত লার্ভা ফুলের উপর বিচরণকালে শ্রমিক মৌমাছির পদ উপাঙ্গে লেগে যায় এবং এইভাবেই ওদের বাসাতে পৌঁছে যায়।

খুবই জোরালো প্লাস্টার হিসাবে কান্থারাইড খুবই ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়িক ক্যান্থারাইড প্রস্তুত করতে ইলাইট্রা শুকিয়ে পাউডারে পরিণত করা হয়। ফোস্কার উপর ক্যান্থারাইডের প্রয়োগ উপশম ঘটায়। এছাড়া ডাক্তারী শাস্ত্রের অনেকক্ষেত্রে ক্যান্থারাইডিন ছ্যাস কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ অঙ্গের উত্তেজনা ঘটাতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ভারতবর্ষের ব্লিস্টার বিটল-এর একটি বৈজ্ঞানিক নাম Epicauta hirticornis।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া, 24 পরগনা।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

KJB/Aug/6/86

এ্যাইও ছোঁড়া, বিনা টিকিটে খেলা দেখা হচ্ছে? আভি চলো থানা মে!
ক্যাঁক!
র‍্যাস্কেল পটলা, তুই এখানে কোন ধান্দায়?
ধান্দা সেম সেম! গেম হচ্ছে ভেতরে কিন্তু তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছ কেন বুঝতে পারছি না?
র‍্যাস্কেল, খামোখা কেউ হাত-পা ছোঁড়ে? আমি খেলা দেখছিলুম।
বেড়ার গায়ে কোন ফাঁক-ফোঁকর নেই— খেলাটা দেখছিলি কেমন করে?
ইডিয়েট, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কিছুই অসম্ভব নয় জানবি।
এটার এক প্রান্তে চোখ দে, তাহলে তুইও সব স্পষ্ট দেখতে পাবি।
আরিস্‌সাব্বাস!
এটা তো বেড়ে মজার কল তৈরী করেছিস খুদে! বেড়ার এ পাশ থেকে ওপাশের সব দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নো টিকিট, নো ঝামেলা, নট কিচ্ছু। অপূর্ব!
একে বলে পেরিস্কোপ।

পেরিস্কোপ!
পেরিস্কোপের নাম শুনিসনি? এর মেকানিজম খুবই সিম্পল। ইচ্ছে করলে তুইও এটা তৈরী করতে পারিস।
এরকম একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিবি। এবার দু'টুকরো আয়না নিয়ে বাক্সটার উপরে-নীচে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে মুখোমুখি বসিয়ে দিবি। এতে উপরের ফোকর দিয়ে আসা দৃশ্য প্রথম আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় আয়নায় তার প্রতিফলন—'রিফ্লেকশন' হবে। এখন নীচের ফোকরে চোখ রাখলেই বাইরে ঐ প্রতিফলিত দৃশ্য সহজেই দেখতে পাবি।
ব্যাস হয়ে গেল!
দেখি একবার!
সাবমেরিন, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ট্যাঙ্ক ইত্যাদিতে এই পেরিস্কোপ অপরিহার্য।
আমাদের এই খেলা দেখার ব্যাপারটা বাদ দিলি কেন?
ঘ্রঁও!
ঘ-র-র-র! দেখেছিস কি, এক কামড়ে তোকে সোজা ইনজেকশনের ধাক্কায় ফেলে দিতে পারি। ছাগলকোথাকার!
তবে রে কুত্তার বাচ্চা! র-র-র-রৎ-
বাপরে!
পটল সাবধান! সামনের দিকে—
দেখেছি তো। সব দিকেই চমৎকার দেখতে পাচ্ছি!
পালা— ছাগল!
কোথায়?

এঃ, একেবারে মোক্ষম ঝেড়েছে!
দাদাম
ধাড়াম
ইঁয়াউ!
হায় ভগবান! পটল যে একেবারে বেড়া টপকে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লো!
আমার কি দোষ, আমি তো ওকে প্রথমে সতর্ক করে দিয়েছিলুম,
উজবুকের মত যেখানে সেখানে পেরিস্কোপ ব্যবহার করলেই হল! এই কারণে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা দরকার।
ভেতরে একবার খোঁজ নিতে হচ্ছে, ওর কি হল! আরে একটা স্ট্রেচারে কাকে যেন বয়ে নিয়ে আসছে!
পটল! এ্যাই থামো, আমাকে একবার দেখতে দাও পটলকে!
ঠক্কাং
ঘ্রাপস!
মনে হয়, পটল এবারে ঠিকমত পেরিস্কোপ ব্যবহার করতে ভুল করেনি!

প্রথম ভারতীয় এফ. আর এস আর্দেশীর কার্শেটজী

বিমলেন্দু মিত্র

আমরা কিন্তু বরাবরই জানতাম যে প্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. (F. R. S.) হচ্ছেন শ্রীনিবাস রামানুজন এবং দ্বিতীয় হচ্ছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য করা হয় একমাত্র তাঁদেরই যাঁরা বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সম্মান ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। যেমন আমাদের দেশেরই পরের যুগের এফ. আর. এস. হচ্ছেন স্যার সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, হোমী ভাবা, সত্যেন বসু, এস. কে. মিত্র অথবা বর্তমানের এম. জি. কে মেনন ও দেবেন্দ্র লাল প্রভৃতি। কিন্তু জানা যাচ্ছে যে প্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. হচ্ছেন বোম্বাই-এর শ্রী আর্দেশীর কার্সেটজী (Ardeseer Cursetjee)। তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন বিগত শতাব্দীতে 1841 খ্রিস্টাব্দের সাতাশে মার্চ তারিখে। জগদীশচন্দ্রের জন্মেরও সতেরো বছর আগে।

কে এই আর্দেশীর কার্সেটজী? আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে তিনি কোন কৃতিত্বের জন্যে এফ. আর.. এস. হলেন?

লাওজী ওয়াডিয়া পার্শী বংশের বিখ্যাত পুরুষ। তিনি সুরাট থেকে 1736 খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে এসে বোম্বাই বন্দরের প্রথম 'ডকের' (Dockyard) পত্তন করেন, অর্থাৎ তিনি জাহাজ তৈরি করতে শুরু করেন। কার্সেটজী ছিলেন সেই পার্শী পরিবারের সন্তান। তাঁর জন্ম হয় 1808 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের 6 তারিখে। তাঁর বাবার নাম কার্শেটজী রুস্তমজী। তিনি ছিলেন বোম্বাই ডকইয়াডের Master Builder বা জাহাজ তৈরির কারখানার প্রধান। স্বভাবতই ছেলে আর্দেশীর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই ঐ জাহাজ-কারখানায় ঢুকলেন শিক্ষানবিশ (Apprentice) হয়ে। আর্দেশীরের সাধারণ শিক্ষা কতদূর ছিল তা বলা কঠিন। তবে তিনি নিজে লিখেছেন যে 1830 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি স্টীম এঞ্জিন বিষয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেন আর সেই সঙ্গে মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিংও। তিনি লিখেছেন,—"বিজ্ঞানের প্রতি গভীর ভালবাসাই আমাকে চালিত করল একেবারেই একার চেষ্টায় একটি এক হর্স পাওয়ারের স্টীম এঞ্জিন তৈরি করতে। আমার দেশবাসীর কাছে বাষ্পের অমিত শক্তির কথা আমি প্রচার করবার কাজে নেমেছিলাম আর সেজন্যে আমার নিজের খরচে ইংল্যাণ্ড থেকে একটি জাহাজী স্টীম এঞ্জিন (Marine Engine) তৈরি করিয়ে আনি। বোম্বাইতে এঞ্জিনটি এসে পৌঁছলে আমি এদেশী এক মিস্ত্রীর সাহায্যে সেটি আমার নিজের তৈরি জাহাজে বসিয়ে ফেলি।" জাহাজটির নাম ছিল Indus, 1833 খ্রিস্টাব্দের 16ই আগস্ট ওটি জলে ভাসানো হয়। এটিই এদেশের প্রথম 'ব্যক্তিগত' স্টীমার,—ওদের ডকইয়ার্ডেই আবার তৈরি হল Hugh Lindsay নামের দ্বিতীয় স্টীমার নওরোজী জামশেদজীর তত্ত্বাবধানে। এটির মালিকানা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।

কার্সেটজী ঐ দেশী মিস্ত্রীটির সম্বন্ধে আরও কিছু লিখেছেন। যেমন,—"ঐ মিস্ত্রীটি পাঁচ বছর ধরে ঐ স্টীমারটি চালিয়েছে, কখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটায় নি বা ইঞ্জিনের কোন ক্ষতি করেনি।"

কার্সেটজীর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা জন্মেছিল। দেখা গেল, তিনি আবার বোম্বাই-এ প্রথম গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করেছেন,—প্রথম গ্যাস কোম্পানীর পত্তন করেছেন। 1834 সালের 10 মার্চ বোম্বাই-এর গভর্নর আর্ল অব ক্লেয়ারকে নিমন্ত্রণ করে গণ্যমান্য লোকদের সামনে কার্সেটজীর নিজের বাংলোর ভেতরে বাইরে সুসজ্জিত বাতিদানে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গ্যাসালোকের উদ্বোধন করা হল।

শুধু গ্যাস কোম্পানীই নয়, দেখা যাচ্ছে 1834 খ্রিস্টাব্দের বোম্বাই গেজেট পত্রিকা খবর দিচ্ছে, বোম্বাই-এ প্রথম স্টীম পাম্প চালু করলেন আর্দেশীর। এর জন্যে তিনি নিজস্ব একটি প্রকাণ্ড ঢালাই কারখানাও চালু করলেন।

সে সময়ে বোম্বাই এর এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশনে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অঙ্কের অধ্যাপক অর্লেবার বোম্বাই সরকারকে অনুরোধ করলেন, যেন যন্ত্র-বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ক্লাশে 'ডেমনস্ট্রেশন' (প্রদর্শন) পরীক্ষা করে দেখাবার জন্যে তাঁরা আর্দেশীর কার্সেটজীকে নিয়োগ করেন। তাই হল।

এই সময়ে অর্থাৎ 1839 খ্রিস্টাব্দে আর্দেশীর বিলেতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। তিনি সুয়েজ পর্যন্ত জলপথে গিয়ে (Berenice নামের জাহাজে) স্থলপথে ইউরোপের দিকে যাত্রা করলেন। এই যাত্রার খুব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তিনি রেখে গেছেন তাঁর বই 'Overland journey from Bombay to England'-এ। তিনি আরও একখানি বই

লিখেছিলেন, 'A year's residence in Great Britain' অর্থাৎ এক বছরের বিলাত-বাস। এতে খুব মজার কথা আছে, যথা তিনি লিখছেন, (1841 সালে) "লণ্ডনের পথঘাট খুব নোংরা, সে তুলনায় বোম্বের রাস্তাঘাট অনেক পরিষ্কার।"

ইংল্যাণ্ডে পেঁছে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান রিচার্ড জেন্‌কিন্‌সের সঙ্গে দেখা করলেন। স্থির হল, তিনি Seaward কোম্পানীর টেম্‌স্‌-তীরের কারখানায় যোগ দিয়ে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করবেন। 1840 সালেই তিনি Society for Arts and Science-এর সদস্য হলেন। ঐ বছরই British Association-এর যন্ত্রবিদ্যার শাখায় তিনি সদস্য হিসাবে যোগ দিলেন। দেখা যাচ্ছে, ইংলণ্ডের বিশিষ্ট লোকেরা আর্দেশীরকে সাদরে তাঁদের নিজেদের মহলে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করছেন,—যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ বেইলী, বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার জন হবহাউস, London Times-এর মালিক মিঃ ওয়াল্টার প্রভৃতি।

10 ফেব্রুয়ারী 1840 খ্রিস্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিয়ে হল। আর্দেশীর উপস্থিত ছিলেন সেই বিয়েতে। সেই বিয়েতে নাকি নানারকমের রঙ্গীন লণ্ঠনের ভেতরে গ্যাসের আলো দিয়ে চতুর্দিক সাজানো হয়। আর্দেশীর মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন—"the most brilliant lights being jots of gas within coloured glass shades."।

ঐ বছরের পয়লা জুলাই মহারানী আর্দেশীরকে তাঁর দরবারে আহ্বান জানান। আর্দেশীর সে ঘটনার কথাও উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখে গেছেন।

এই সময়ে বোম্বাই-এর Steam factory তে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও 'মেশিনারী ইনস্পেক্টর'-এর পদটি খালি হয়। বিলেতে London Times পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আর্দেশীর দরখাস্ত করলেন আর খাস বিলেতে বসে বহু সাহেবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঐ পদে মনোনীত হলেন। সে যুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে এ যেন অসাধ্যসাধন! যে সংস্থার তিনি প্রধান হলেন সেখানে তাঁর অধীনে প্রায় দেড়শো জন ইউরোপীয় কাজ করবে! ইংরেজের স্বার্থ-রক্ষাকারী খবরের কাগজ, Bombay Times এই তথাকথিত 'অন্যায়ের' ঘোরতর প্রতিবাদ করে সম্পাদকীয় লিখল। কিন্তু একাজে আর্দেশীরের চেয়ে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া সম্ভব হল না। আর্দেশীর ঐ পদে 1857 পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। ঐ বছরই তিনি নিজে থেকে অবসর নেন।

ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে বিদেশস্থিত মেম্বার হিসাবে মনোনীত করে 1837 খ্রিস্টাব্দে। বোম্বাই মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউশনের তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি।

1841 সালের 27 মার্চ ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভ্য নির্বাচিত হলেন আর্দেশীর। জানা যাচ্ছে, তাঁর নাম প্রস্তাব করেন জেমস্‌ ওয়াকার, সমর্থন করেন উইলিয়ম কিউবেট (W. Cubett), অন্যান্য যাঁরা প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে জন ম্যাকমাইল, জেম্‌স্‌ হর্‌নর্‌, ডব্লু এইচ সাইক্‌স্‌, অ্যাড-মিরাল বিউফোর্ড, স্যার এডওয়ার্ড স্যারাইন প্রভৃতি। তাঁর সম্বন্ধে যে বিবরণ পেশ করা হয়, তাতে তাঁকে বলা হয়েছে—

Gentleman, well versed in the theory and practice of Naval Architecture এবং নিজে স্টীম এঞ্জিন ও জাহাজ তৈরি করা ছাড়াও আর্দেশীর—having otherwise promoted science and the useful art of his own country,—ইত্যাদি। আর্দেশীর এদেশে প্রথম সেলাই-এর কল ও প্রথম ফটোগ্রাফির স্টুডিওর পত্তন করেন। আর্দেশীরের জীবন একের পর এক সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে ভরা। 1855 সালে তিনি Justice of the Peace হলেন। 1861 সালে করাচির Indus Flotilla নামের জাহাজী কোম্পানীতে তিনি 'Superintending'-ইঞ্জিনিয়ার হলেন।

পরিণত বয়সে তিনি বিলেতেই চলে যান আর রিচমণ্ড শহরে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু হয় 1877 সালের 16 নভেম্বর, বিলেতেই। তাঁর ছেলেও ছিলেন জাহাজ-ইঞ্জিনিয়ার, বোম্বাই-এর Mazagaon ডকে সম্পূর্ণ দেশী মালমশলা কাজে লাগিয়ে দেশী মিস্ত্রী খাটিয়ে 80 টনের "Lowjee Family" নামের স্টীমার তৈরি করেন। ছেলের নাম ছিল রুস্তমজী আর্দেশীর।

---

* বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা-9

সিদ্ধার্থ ঘোষের ধাঁধা ও অঙ্কের খেলা

অঙ্কের ম্যাজিক ও খেলার লজিক ॥ ১৫·০০

স্যামলয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা ॥ ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার কাহিনী

বরুণ মণ্ডল

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস কস্টিক পটাশের জলীয় দ্রবণের উপস্থিতিতে একটি কাচের গোলকে বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে তড়িৎক্ষরণ ঘটিয়ে বায়ুতে মিশ্রিত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি করলেন। কস্টিক পটাশের দ্রবণে নাইট্রোজেন-অক্সাইড শোষিত হওয়ার পর গোলকে কিছু অতিরিক্ত নাইট্রোজেন থেকে গেল। কারণ বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের তুলনায় বেশি। বাইরে থেকে অক্সিজেন গোলকে পাঠিয়ে পুনরায় তড়িৎ-ক্ষরণ ঘটাতে গোলকের নাইট্রোজেন সম্পূর্ণরূপে নাইট্রোজেন-অক্সাইডে পরিণত হল। এই নাইট্রোজেন অক্সাইডও কস্টিক পটাশের দ্রবণে শোষিত হল। ক্যাভেণ্ডিস এবার সেই গোলকে জল ভরে দেখলেন অল্প পরিমাণে গ্যাস ভিতরে আছে। কিন্তু কোন গ্যাসই তো থাকার কথা নয়। তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের একটি মিশ্রণ। ক্যাভেণ্ডিস পরীক্ষাটি আবার করলেন। এবারও পূর্বের মত অল্প পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গেল। গ্যাসটা যে কি এবং কোথা থেকে এল —এই প্রশ্নের উত্তর ক্যাভেণ্ডিসও দিতে পারলেন না। পারলেন না সে সময়ের অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও।

তারপর প্রায় একশ' বছর কেটে গেছে। অধ্যাপক উইলিয়াম র‍্যামজে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। নাইট্রোজেন গ্যাস নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় তিনি তখন যুক্ত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস চালিয়ে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড তৈরি করা। পূর্বের ধারণা মত বিশুদ্ধ বায়ুতে আছে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। অধ্যাপক র‍্যামজে বিশুদ্ধ বায়ু থেকে অক্সিজেন অপসারিত করে যে নাইট্রোজেন পেলেন তা বায়ু শূন্য পাত্রে রাখা উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে পাঠালেন। ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড তো তৈরি হল কিন্তু পরীক্ষা পাত্রে কিছুটা গ্যাস থেকে গেল —যা কিছুতেই ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করল না। র‍্যামজের ধারণা হল বায়ুতে নিশ্চয়ই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়া অন্য কোন গ্যাস আছে।

একই সমস্যার সম্মুখীন হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যালে। তাঁর গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বিভিন্ন গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়। হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন দুটি উৎস থেকে— একটি নাইট্রোজেনের যৌগ থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন থেকে, অন্যটি বিশুদ্ধ বায়ু থেকে অক্সিজেন অপসারিত করে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন থেকে। কিন্তু কি আশ্চর্য দু'ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া গেল দু'রকম। এমন তো হবার কথা নয়। উৎস যা-ই হোক না কেন, একই গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব সব সময় একই।

বিজ্ঞানী র‍্যালে ক্যাভেণ্ডিসের পদ্ধতিতে অজানা এই গ্যাসটি সংগ্রহ করলেন। বিজ্ঞানী র‍্যামজের পাওয়া গ্যাসটির সঙ্গে এই গ্যাসটির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন— দু'টি গ্যাসই নিষ্ক্রিয়। আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্যের কারণও জানা গেল। নতুন এই গ্যাসটির হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গুরুত্ব হল কুড়ি।

বিজ্ঞানী র‍্যালে ও র‍্যামজের প্রচেষ্টায় জানা গেল বায়ু শুধু মাত্র অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ নয় এবং আবিষ্কৃত হল নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, র‍্যাডন, জেননকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। কারণ এরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসাবে এই সব মৌলকে চিহ্নিত করা হলেও সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্রিপটন, র‍্যাডন, জেনন গ্যাসগুলোর যৌগ গঠনে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগী শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণের পরিবর্তে এখন হিলিয়াম ও অক্সিজেনের মিশ্রণ ব্যবহার করছেন। হিলিয়ামের ঘনত্ব নাইট্রোজেনের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস পূর্বের তুলনায় সহজ ও স্বাভাবিক হয়। ডুবুরীরাও জলের নিচে ব্যবহারের জন্য অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করেন। কারণ পূর্বের মিশ্রণ অপেক্ষা এই মিশ্রণ তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর উপকারী।

73, শ্রীধর রায় রোড, কলি-39

একালে কাঠের বোর্ডে লিখে সংবাদ প্রচার করা হত। এগুলোই তখন সংবাদপত্রের কাজ করত। সংবাদ সংগ্রহ করা হত পর্যটকদের কাছ থেকে আর দেশের সরকারি সূত্র থেকে। বোর্ডে লিখে সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত অবশ্য কিন্তু বোর্ড তো সংবাদপত্রের মতো হাতে নিয়ে যেখানে খুশি ঘোরা যেত না।

প্রকৃত সংবাদপত্র ছাপা হয়ে বেরোয় চীনদেশে প্রায় তেরোশ বছর আগে। এই সময়ে চীন সরকার 'চিং পাও' (Tching Pao) নামে একটি পত্রিকা ছাপিয়ে বের করেন। পত্রিকাটির নামের মানে হল 'রাজধানীর সংবাদ' (News of the Capital)। এভাবে সরকার দেশের প্রয়োজনীয় উন্নতিমূলক কাজগুলোর সংবাদ জনসাধারণকে জানাতে সক্ষম হতেন।

প্রাচীনকালে রোমেও একটি সরকারী সংবাদপত্র ছিল। এটি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হত। এই পত্রিকার নাম ছিল 'এ্যাক্টা ডায়ার না'। এই নামের অর্থ হল দৈনিক ঘটনাবলী (Daily Happenings)। এই দুটোই হল প্রথম সংবাদপত্র যাদের সম্পর্কে আমাদের তালিকা রয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই লোকেরা সংবাদপত্র কিনে পড়তে শুরু করে। ভেনিসের সরকার একটি পত্রিকা বের করেন। তার নাম ছিল 'নোটিজিএ স্ক্রিটে (Notizie Soritte)। এই নামের অর্থ হল 'লিখিত সংবাদ'। লোকের এই সংবাদপত্রের প্রতিসংখ্যার জন্যে 'এক' গেজেট (Gazetta) দাম দিত।

অষ্টাদশ শতক থেকে সংবাদপত্র কম বেশি নিয়মিত বেরোয়। এসব সংবাদপত্রে শুধু সংবাদের পরিবেশন থাকত না সঙ্গে মতামতও প্রকাশ করা হত। এই ধরনের কাগজ 1663 খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন শহরে বেরোতে শুরু করে। এর নাম ছিল 'দ্য ইনটিলিজেন্সার' (The Intelligencer)। প্রথম দিকের সংখ্যাগুলো সপ্তাহে একবার বেরোতো। কারণ সংবাদের আদান ও কাগজের উৎপাদন ধীরগতিতে চলতো।

আমেরিকার প্রথম সংবাদপত্রের নাম ছিল 'পাব্লিক আকারেন্সেস্' (Public Occurrences)। এই পত্রিকাটি 1690 খ্রিস্টাব্দে বস্টনে (Boston) ম্যাসাচুসেটস-এ বেরোয়। এই উপনিবেশের শাসনকর্তা গভর্নর এটাকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেন। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) 1729 থেকে 1765 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'দ্য পেন্সিলভানিয়া গেজেট' (The Pennsylvania Gazette) নামে একটি পত্রিকা পরিচালনা করেন। 1752 খ্রিস্টাব্দে উপনিবেশগুলোতে মাত্র দুটি সংবাদপত্র ছিল। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের (American Revolution) সময়ে সেখানে প্রচলিত ছিল সাইত্রিশটি সংবাদপত্র।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'দ্য লণ্ডন টাইমস্' (The London Times) খুব সম্ভব 1785 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং আজ অবধি তা প্রকাশিত হচ্ছে।

---

100 যোধপুর পার্ক, কল-68

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

তিরিশটি মডেলের সরল সচিত্র-নির্মাণ পদ্ধতি।

প্রকাশিত হয়েছে। দাম দশ টাকা। ভি. পি. ১২···

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

সিলভার বার্চ

শঙ্কর ঘটক

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

কাক ডাকার আগে কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙাবার মত একজন লোকই আমাদের বাড়িতে আসে। সে হল অনুকূল। ফার্স্ট বনগা লোকালে চেপে মছলন্দপুর থেকে আমাদের দমদমের বাসায় আগেও সে বহুবার এসেছে।

—কি রে! ঘুম থেকে এখনো উঠিস্‌নি?

ধপ্‌ করে সোফায় বসল অনুকূল। ওর পেল্লায় ফোলিও ব্যাগটা পাশে রেখে পাদুটো সামনে টান টান করে বসে রইল।

—ফার্স্ট ট্রেনে এলি?

—ফার্স্ট ট্রেনে নয়, বরং বলতে পারিস ফার্স্ট প্লেনে। অবশ্য প্লেনের ফার্স্ট সেকেণ্ড কিছু নেই। সারা রাতই প্লেন ওড়ে আকাশে। বিরাম নেই কোন। আমি ভোর সাড়ে তিনটার সময় এয়ার পোর্টে পা দিলাম। একটা ট্যাক্সি নেই কোথাও। অপেক্ষা করে করে শেষে বাসেই আসতে হল।

অনুকূলের গলার আওয়াজটি কিন্তু অমাইক। মাইক ছাড়াই ওর গলার শব্দ বেশ ছড়িয়ে পড়তে পারে চারদিকে। মা, বাবা, দিদি সবাই জেগে গেছেন সেই শব্দে।

—অতনু, আজকের কাগজটা কোথায় রে?

—কাগজ? এত সকালে? সে ত এখনো পত্রিকা অফিসেই পড়ে আছে বিলির অপেক্ষায়। কিংবা শেষ সংখ্যাগুলো ছাপা হচ্ছে এখনো।

—হোপলেস্‌। প্যারিসে ঘুম থেকে উঠেই দেখি কাগজ রয়েছে সামনে। যাক্‌গে, গতকালের কাগজটা দেখেছিস কি তুই ভাল করে? কোন জাহাজ ডুবির ঘটনা টটনা আছে তাতে?

ভাল করে ভাবার চেষ্টা করি। না, সেরকম কোন খবর ত পড়েনি চোখে।

—তুই কি কোন জাহাজ ডুবিয়ে এলি নাকি? মুচকি মুচকি হাসে অনুকূল।

—ব্যাটা এখনো ডোবেনি তাহলে। ডুববে, ডুববে, অবশ্যই ডুববে। আমার হিসেব ভুল হবার নয়।

এতক্ষণে মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

—খুব জোর বেঁচেছি কাকিমা। ব্যাটা নিকোলাস। আমার এখনো গা শিউরে উঠছে শয়তানটার কথা ভাবলে। এবারে ওঠা শেষ হবে।

—নিকোলাস?

চমকে ওঠে দিদি।

—নিকোলাসের ত এখন পুলিস হাজতে থাকার কথা।

—ঠিক তাই। আমারও ধারণা ছিল তাই। কিন্তু দু-কোটি ফ্রাঁ-এর বিনিময়ে বেঞ্জামিন যে নিকোলাস সেজে জেল খাটছে সে খবর আমি পেয়েছিলাম অনেক পরে। তখন কিছুই করার ছিল না আমার।

আগেই বলেছি, তখন আমি মেক্সিকোর সোলিনা ক্রুজ বন্দরে প্রফেসর লিণ্ডোয়ালের তত্ত্বাবধানে রাসায়নিক ক্ষয় সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যস্ত। আসলে আমাদের নির্দিষ্ট কাজ ছিল জাহাজ সংক্রান্ত। কোন জাহাজকে দীর্ঘদিন সমুদ্র জলের ওপর রাখা প্রচুর খরচের ব্যাপার। লবনাক্ত সমুদ্র জল জাহাজের খোলটিকে আক্রমণ করে। একে বলে রাসায়নিক আক্রমণ। রাসায়নিক ক্ষয়। বাইরের আবরণটি একটু

একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকা। এর জন্য নিয়মিত জাহাজকে বন্দরে নিয়ে এসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রঙ করতে হয়। আমরা এমন একটা কিছু বার করতে চাই যা দিয়ে জাহাজ বানালে তা আর সমুদ্র জল দিয়ে আক্রান্ত হবে না।

আমাদের কাজটি স্পনসর্ড প্রজেক্টের অন্তর্গত। কোন সংস্থা নগদ টাকার বিনিময়ে আমাদের দিয়ে গবেষণা করাচ্ছেন। এ সমস্ত প্রজেক্টের কাজকর্ম সফল না হলে খুবই অসুবিধা। সব চাইতে বড়ো ঝামেলা অন্য কেউ এরপরে আমাদের অর্থ সাহায্য করবে না। উদ্‌ভ্রান্ত পরিশ্রম করছি আমরা। এমন কোন বস্তু নেই যা দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি না। সব চাইতে ভালো পুরো জাহাজটিকে প্লাটিনাম দিয়ে মুড়ে দেয়া। কিন্তু এ প্রস্তাব দিলে আমাদের নির্ঘাৎ পাগলা গারদে ভরে দেবে। এক গ্রাম প্লাটিনামের দাম এখন প্রায় সাতশ টাকা।

গভীর ভাবে পড়াশুনা করছি, এমন সময় আমার কাছে এলো একটি চিঠি।

বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী স্যাণ্ডারসন লিখেছেন চিঠিটি। ভদ্রলোকের নাম অজানা নয়। কিন্তু আমার সংগে ওনার সাক্ষাৎ কোন পরিচয় ছিল না। তাঁর চিঠি পেয়ে বেশ অবাকই হলাম।

চিঠিটি পড়ে কিন্তু আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্‌স্টিট্যুটের তরুণ বিজ্ঞানী আমার বন্ধু ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে আমার সম্পর্কে খবর পেয়ে খুব গোপন এই চিঠিটি দিয়েছেন। ইন্দ্রজিতই বা ওনার কাছে আমার সম্পর্কে এমন সার্টিফিকেট দিল কেন তা আমার মাথায় ঢুকল না।

চিঠির বিষয়বস্তু যে-কোন কল্পবিজ্ঞানের গল্পকেও হার মানায়। চিঠিটা পড়ে আমি হতাশ হয়ে ভাবছি, শেষ পর্যন্ত স্যাণ্ডারসনের মতো বিজ্ঞানীরও মাথায় গোলমাল দেখা দিল।

মায়ের হাতের কাঁচের প্লেটের ওপর রাখা গোল গোল লুচিগুলোর দিকে নজর চলে গেল অনুকূলের। লুচি খেতে খেতে চিঠির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে অনুকূল।

—স্যাণ্ডারসন লিখেছে সে নাকি পর্যায় সারণী 126 নম্বরের মৌলটি সংশ্লেষ করতে সমর্থ হয়েছে। এ এক হাস্যকর দাবি।

আমার দিকে তাকায় অনুকূল।

—তুই ত কেমিস্ট্রি পড়েছিস। জানিস নিশ্চই যে 104 নম্বর মৌলটি, যার নাম কুর্চাতি ভিয়াম, তার অর্ধায়ুকাল এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের তিন ভাগ। পারমাণবিক সংখ্যা যত বাড়বে ততই তার স্থায়িত্ব আরও কমবে এটাই নিয়ম।

অনুকূল বাবার দিকে তাকায় এবার। একটু থেমে আবার শুরু করে ওর বক্তৃতা।

—কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন যে একটা নতুন পর্যায় শুরু হতে পারে 126 নম্বর মৌলটি দিয়ে যেগুলো অনেক স্থিতিশীল। অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় কিন্তু বেশ স্থায়ী। বিজ্ঞানীরা তাই এই মৌলটিকে সংশ্লেষ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বহুদিন ধরে।

এবারে বাবা মুখ খোলেন।

—তা, স্যাণ্ডারসন এটি সংশ্লেষ করতে পেরেছেন বলে যে দাবি করেছেন তা তুমি হাস্যকর বলছ কেন? হতেও ত পারে!

সশব্দে হেসে ওঠে অনুকূল।

—অসম্ভব! এমন একটা বিরাট মাপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চাপা থাকতে পারে না। বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ। চুপি চুপি আমার মত এক নগণ্য ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখে এ আবিষ্কারের কথা জানাতে হয় না।

আমি স্যাণ্ডারসনের চিঠি নিয়ে দেখা করলাম লিণ্ডোয়ালের সংগে। চিঠিটি পড়ে লিণ্ডোয়াল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

– স্যাণ্ডারসন তোমার সাহায্য চায় লিখেছে। তুমি চিঠিটা একটু আমার কাছে রেখে যাও। আর আবার একবার ফ্রান্সে যাবার জন্য তৈরি হও। ঘণ্টাখানেক পরে এসে চিঠিটা নিয়ে যেও।

আমি আবার তৈরি হলাম ফ্রান্স যাত্রার জন্য। ঘণ্টা খানেক বাদে প্রফেসরের ঘরে ঢুকে দেখি ওনার মুখ থম থমে। আমাকে ইশারায় বসতে বলে উনি চলে গেলেন ওনার ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে। বেশ কিছু কাগজ-পত্রের তাড়া নিয়ে আবার এসে বসলেন নিজের চেয়ারে।

আমার হাতে একটা ম্যাগাজিন দিলেন তিনি।

—ডক্টর দাস, এতে তুমি স্যাণ্ডারসনের একটা ছবি পাবে। ওনাকে চিনতে সুবিধা হবে তোমার। সম্ভবত তোমার কাছে জাহাজ সংক্রান্ত উপদেশ চাইবে ওরা। তোমার বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। জ্ঞান বুদ্ধি মতো সাহায্য করো ওদের। আর—যে চিঠিটি তুমি পেয়েছ সেটি স্যাণ্ডারসনের নিজের হাতে লেখা নয়। হতে পারে ওনার কোন সহকারী ওটি লিখে দিয়েছে। এমনকি সইটি সমেত।

একটু হেসে তিনি বলেন,

—একটু সতর্ক থেকো।

অতঃপর আবার ফ্রান্স। স্যাণ্ডারসনকে তার করা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে আমার কোন প্লেন ফ্রান্সের মাটি স্পর্শ করার পর থেকে স্যাণ্ডারসনের ফ্ল্যাটে যাওয়া পর্যন্ত কোন রকম কষ্ট করতে হয়নি। সব কিছু ব্যবস্থা উনিই

করে রেখেছিলেন। একটা পুরো ফ্ল্যাট্ আমার জন্য ব্যবস্থা করা ছিল। আরাম করে খেয়ে দেয়ে দুপুর বেলা একটা চমৎকার ঘুম সেরে সন্ধের মুখোমুখি জাগলাম। সবই ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু আসল ব্যক্তির দেখা নেই। জরুরী তলব পাঠিয়ে যে ডেকে আনল সেই স্যান্ডারসন কোথায়? আমি এখানে পা দেবার পরে প্রায় বার ঘণ্টা পেরোতে চলল, সে এর মধ্যে পাঁচ মিনিটের জন্যও কি আমার সংগে দেখা করার সুযোগ পেল না! মনের ভেতরে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে।

রাত দশটার সময়, আমি যখন ফের শুতে যাবার কথা ভাবছি, আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। দরজা ভেজানো ছিল। ভেতর থেকেই আগন্তুককে ভেতরে আসতে বললাম।

তারপর দরজা খুলে যে ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করল তাকে দেখে আমি স্তম্ভিত!

—নিকোলাস! তুমি এখানে?

নিকোলাসের সারা মুখ হালকা হাসিতে ভরে গেল।

—খুব অবাক হয়েছ দেখে, তাই না?

—খুব যে একটা অবাক হয়েছি তা অবশ্য নয়। তোমার মত লোকের পক্ষে সবই সম্ভব তা আমি জানি। কিন্তু জেল খাটছে কে?

—বেঞ্জামিন। একটি দরিদ্র ছেলে। নিকোলাসের নামে সেই জেল খাটছে।

নিকোলাস ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সামনের সোফায় এসে বসল।

—স্যান্ডারসনের নামে চিঠিটা আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি তা বুঝেছ নিশ্চই এখন। অবশ্য অন্য লোককে দিয়ে লিখিয়েছিলাম কেননা আমার হাতের লেখা তুমি চেনো। ঐ 126 নম্বর মৌলটি আমিই আবিষ্কার করেছি।

আমি আর থাকতে পারলাম না।

—তুমি কি 126 টা প্রোটন, 126 টা নিউট্রন আর 126 টা ইলেকট্রনকে ভরে দিলে কোন শূন্য পরমাণুর খোলের মধ্যে?

হো হো করে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল নিকোলাস।

সে সব ত কল্পবিজ্ঞানের লেখকরাই করে থাকেন বলে শুনেছি। বিজ্ঞানীরা এমন কাজ করতে পারে নাকি?

—তবে কি ভাবে তুমি এমন অসাধ্য সাধন করলে?

—যে ভাবে সমস্ত কৃত্রিম মৌলগুলো সংশ্লেষিত হচ্ছে। একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আরেকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়ে আঘাত করে। আমি একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আরেকটা ইউরেনিয়ামের আয়নিত পরমাণু দিয়ে আঘাত করেছিলাম। ইউরেনিয়ামের পরমাণুতে

নিকোলাসের সারা মুখ হালকা হাসিতে ভরে গেল

আছে 92টি প্রোটন, তার সংগে যুক্ত হল আরো 92টি প্রোটন। যে নতুন মৌলটি তৈরি হল তার পারমাণবিক ক্রমাংক হল 92+92=184। কিন্তু এই নতুন মৌলটি তৎক্ষণাৎ ভেঙে গিয়ে তৈরি করল দুটো মৌল। একটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 58 অন্যটির 126। সিরিয়াম আর 126 নং মৌল।

—চমৎকার বক্তৃতা।

আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম।

—আমায় কি করতে হবে এবার।

—অতি সহজ। প্যারিস থেকে কোবিল্ডা শুধু এইটুকু। প্যারিস থেকে বন্দর সড়ক পথে জিনিসটা আমি এনে দেব। সেখান থেকে জাহাজে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকের ওপর দিয়ে আফ্রিকাকে আধ চক্কর পাক খেয়ে কোবিল্ডা। ব্যাস—তোমার কাজ শেষ, বাকিটা আমার দায়িত্বে।

—দেখো, আমি জাহাজের খোলের বিশেষজ্ঞ হলেও

জাহাজের খবর বিশেষ রাখি না। তোমার জাহাজ বানাবার দায়িত্ব তুমি বরং কোন দক্ষ নাবিকের হাতে তুলে দাও।

—আরে না না। তুমি জাহাজ চালাবে কেন? তুমি শুধু জাহাজের খোল বানাবার পরামর্শটি দেবে। বাকি সব কাজ আমার। দীর্ঘদিন জাহাজটিকে সমুদ্রে থাকতে হবে। সমুদ্র জলের তীব্র রাসায়নিকের আক্রমণে জাহাজটা যাতে ক্ষয়ে না যায় সেটি দেখাই তোমার দায়িত্ব।

জলের মত সব পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। ঐ সব 126 নম্বর মৌল টৌল সব বাজে। আগের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার পর নতুন রাস্তা ধরেছে নিকোলাস। আফ্রিকার উপকূল ভাগে কোন বৃহৎ নিউক্লিও বিস্ফোরণ বা এ জাতীয় কিছু করতে চায় সে।

নিকোলাস এবার কড়াচোখে আমার দিকে চায়।

—দেখো দাস, যদি তুমি আমাকে সাহায্য না করো তবে এখানেই তোমার শেষ। জাহাজ তৈরি শেষ হবে, রাসায়নিক পরীক্ষা শেষ হবে, আর আমরা মাঝ সমুদ্রে পৌঁছে যাব তারপর তোমার মুক্তি হবে। ততক্ষণ তুমি আমার হাতে বন্দী।

অগত্যা আমাকে নিকোলাসের জাহাজ বানাবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হল। বন্দী জীবন কাটাতে হলেও আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ছিল না নিকোলাসের। শেষ পর্যন্ত সেই জাহাজ নির্মাণের কাজ শেষ হল। সাদা ঝক্‌-ঝকে সেই জাহাজের নাম 'সিলভার বাড'। নিকোলাসের যাত্রাও শুরু হল গত সপ্তাহে। যাবার সময় নিকোলাস আমার হাতে ফেরার টিকিট দিয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নির্দেশ দিয়ে গেল সময় মত আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য।

আমি অশ্রুসজল চোখে তাকে বিদায় দিলাম, কেননা আমি জানতাম নিকোলাসের সংগে আমার সেটাই শেষ দেখা।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজ এসে গেছে। কাগজ খুলে আমরা অবাক। সত্যিই খবরটি আছে। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর ভাসমান 'সিলভার বাড' জাহাজটির সলিল সমাধি। জাহাজটা নাকি কোনোরকম বিস্ফোরণ ছাড়াই টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে গেছে। চারদিক দিয়ে জল ঢুকে শতছিদ্র জাহাজটির এমন হাল।

—কি ভাবে এরকম জাহাজ বানালাম বল দেখি?

আমি চুপ।

—অতি সহজে। ওর জাহাজের বাইরের খোলটা ছিল জার্মান সিলভারের—জিংক আর কপারের একটা সংকর ধাতু। আর জাহাজটাকে শক্তপোক্ত করার জন্য ছিল স্টিলের সাপোর্ট। দুটো বিসম ধাতু পরস্পরের সংগে যুক্ত। সেটা ভাসছে সমুদ্রের লবনাক্ত জলে। চমৎকার তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হবে সংগে সংগে। দ্রুত রাসায়নিক ক্ষয়ে জাহাজটিও ভেঙে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে।

অনুকূল ঘড়ি দেখে চট্‌পট্‌ উঠে দাঁড়ায়।

অনুকূল চলে যাবার পর বাবাকে চিন্তামগ্ন মনে হল। উঠে গিয়ে তাক থেকে একটা বই নিয়ে এলেন। "এই দ্যাখ, এখানেই আছে। একজন কোটিপতি 'সমুদ্রের ডাক' নামে জার্মান সিলভার দিয়ে এরকমই একটা জাহাজ বানিয়েছিল। সেটাত সমুদ্রের সংস্পর্শে এরকমই ভেঙে গিয়েছিল।"

আর কাগজের খবর?

মা জানালেন কাল রাতের সাড়ে সাতটার খবরেই নাকি এই জাহাজ ডুবির ঘটনাটি ছিল।

নিয়মাবলী ● গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

● কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।

● প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।

● গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।

● M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

● 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।

● ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু এজেন্টদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

প্রচার দপ্তর : কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান
86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

[এক]

কার পায়ের ছাপ ?

জমি স্পর্শ করার পর বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম নীরবে, নিস্পন্দ দেহে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠিনি। হৈ চৈ করতে পারিনি। বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছিল। এনার্জি যেন শরীর থেকে তিরোহিত হয়েছিল। শরীর আর মগজকে বাগে আনতে তাই কিছুক্ষণ বসেছিলাম পাথরের পুতুলের মত। আমাদের আগে অনেকেই অন্য গ্রহে অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে। কিন্তু এরকম অ্যাডভেঞ্চার কেউ করেনি। অনেক বিস্ময় দেখে এসেছে। কিন্তু এরকম বিস্ময় কেউ দেখেনি। কবির কল্পনাতেও এহেন তাজ্জব কাণ্ড দানা বাঁধে কিনা সন্দেহ।

নেমেছি মখমলের মত নরম সবুজ ঘাসের কার্পেটের ওপর। পৃথিবী গ্রহেও আছে এ রকম ঘাস, এ রকম সমুদ্র, পাহাড়, চাষের জমি, শহর, বন আর জনবসতি। তা সত্ত্বেও সভ্য জীবদের কাছ থেকে দূরে থাকা দরকার। জঙ্গল পেরিয়ে এসেছি একটু আগেই। এই জঙ্গলই আড়াল করে রাখবে আমাদের সভ্য জীবদের লোকালয় থেকে।

দিবাস্বপ্ন কেটে গেল একটু পরেই। সন্তর্পণে খুললাম একটা পোর্টহোল। হুস করে বাতাস ঢুকল না ভেতরে। ভেতরের আর বাইরের বাতাসের চাপ সমান। দুর্গ প্রাকারের মত জঙ্গল ঘিরে রেখেছে খোলা চত্বরটাকে। নিথর নিস্তব্ধ অরণ্য। তাপমাত্রা বেশি ঠিকই—কিন্তু অসহ্য নয়। প্রায় পঁচিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

হেকটরকে নিয়ে নেমে এলাম লঞ্চ থেকে। আরও সূক্ষ্মভাবে বাতাস বিশ্লেষণ করলেন প্রফেসর। ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক। বিরল কয়েকটা গ্যাসের মাত্রায় সামান্য অমিল আছে বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে এখানকার বাতাস পৃথিবীর বাতাসের মতই। নিঃশ্বাস নেওয়া চলে অনায়াসেই। কিন্তু সাবধানের মার নেই। পরখ করিয়ে নিলাম নিষ্পাপীকে দিয়ে। মহাকাশের পোশাক খুলে ফেলে পরমানন্দে লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল হেকটর, লাফ দিয়ে উঠল একটা গাছের ডালে। ডাল থেকে ডালে দোল খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন বনানীর মধ্যে। অনেক ডাকলাম। ফিরেও তাকাল না। স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে হেকটর। আর কি ফেরানো যায় ?

খুলে ফেললাম নিজেদের মহাকাশ পোশাক। সুবিধে হল কথা বলতে। ভয়ে ভয়ে পা বাড়ালাম সামনে। লঞ্চ থেকে বেশি দূরে যাওয়ার সাহস নেই কারোরই।

না, কোনো সন্দেহই নেই। যেন যমজ-পৃথিবীতে হাঁটছি তিনজনে। জীবন এখানেও আছে। বিশেষ করে উদ্দাম এখানকার উদ্ভিদ বলয়। কয়েকটা গাছ দেড়শ ফুটেরও বেশি লম্বা। মহীরুহ বললেই চলে। পশুপাখিও আছে। বেশ বড় সাইজের কালো পাখি টহল দিচ্ছে মাথার ওপর। শকুন নাকি ? ছোট পাখিও দেখতে পাচ্ছি। টিয়াপাখি বলেই মনে হল। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে উড়ে যেন চোর পুলিস খেলছে। মাটি ছোঁয়ার আগেই দেখেছি, সভ্য জীবও আছে এখানে। যুক্তিবুদ্ধি আছে তাদের মগজে। জানি না তারা মানুষ কিনা। অতটা কল্পনা করা সমীচীন নয় এই মুহূর্তে। এ গ্রহকে সাজিয়েছে তারাই। অথচ চারপাশের জঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব আছে বলে মনে হল না। অবাক হওয়ার

কিছু নেই। এশিয়ার কোনো জঙ্গলের প্রান্তে নামলে এই রকম নৈঃশব্দ মনের মধ্যে চেপে বসত সেখানেও।

আশ্চর্য এই গ্রহের একটা নাম দেওয়া দরকার। পৃথিবীর সঙ্গে এতই যখন মিল রয়েছে, তখন 'সোরোর' নামটাই লাগসই। নামটা পছন্দ হল তিনজনেরই।

ঢুকে পড়লাম জঙ্গলের মধ্যে। যে পথ ধরে ঢুকলাম তা যেন প্রকৃতির হাতে গড়া। কারবাইন আগ্নেয়াস্ত্র আছে আমার আর আর্থারের হাতে। খালি হাতে রইলেন প্রফেসর। অস্ত্রশস্ত্র তাঁর চোখের বালি। রকেট থেকে মাটিতে নামবার ফলেই বেশ হাল্কা লাগছিল। তাই হাল্কা পায়ে অনেকটা ছাগলছানার মত লাফাতে লাফাতে ঢুকে গেলাম জঙ্গলের মধ্যে।

পর পর হাঁটছি তিনজনে। হাঁটছি আর হাঁক দিচ্ছি হেকটরের নাম ধরে। কিন্তু তার ফেরার নাম নেই। আর্থার ছোকরা হাঁটছিল সবার আগে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। কান পেতে কি যেন শুনছে। শব্দটা শুনতে পেলাম আমিও। কুলকুল করে কোথায় যেন জল বয়ে চলেছে। অনেক দূরে। হাঁটা দিলাম সেইদিকেই। স্পষ্টতর হল শব্দটা।

দেখতে পেলাম একটু পরেই। ছোট্ট একটা জলপ্রপাত। সোরোর গ্রহ যে কত সুন্দর, তা বোঝা গেল এখানে আসতেই। মাথার ওপর থেকে ছোট্ট একটা জলস্রোত চ্যাটালো পাথরের ওপর থেকে সশব্দে আছড়ে পড়ছে নিচের হ্রদে। মাত্র কয়েক গজ ওপরে রয়েছে পাথরটা। জলের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে পাথরের ওপর। নিচের সরোবরে ঝিকিমিকি করছে মধ্য গগনের বেটেলগুজ তারকা। অপরূপ সেই শোভা বর্ণনা করা যায় না। সরোবর ঘিরে পাথর আর বালি। প্রকৃতি যেন অসীম যত্নে সাঁতারের আয়োজন করেছেন নিরালা এই অঞ্চলে ক্লান্ত পথিকদের জন্যে।

ক্লান্ত তো আমরাও। বিশেষ করে আমি আর আর্থার লোভ সামলাতে পারলাম না। রোদ্দুর বেশ চড়া। জামা-কাপড় খুলে ফেললাম। শুধু অন্তর্বাস পরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, বাধা দিলেন প্রফেসর। জলটা আগে পরীক্ষা করা দরকার। ভয়ানক বিষাক্ত তরল পদার্থও তো হতে পারে। হ্রদের পাড়ে গিয়ে ঝুঁকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আঙুল দিয়ে ছুঁলেন খুব সাবধানে। সামান্য পরিমাণ তুলে নিলেন চেটোয়। শুঁকলেন। জিভ ঠেকালেন।

বললেন আপন মনে—'জলই বটে।'

ফের ঝুঁকলেন। হাত ডুবিয়ে দিলেন লেকের জলে। আড়ষ্ট হয়ে গেলেন হঠাৎ। বিস্ময় ধ্বনি জাগ্রত হল কণ্ঠে। তর্জনী তুলে দেখালেন অদূরের বালি। কি যেন দেখেছেন সেখানে।

দেখলাম আমিও। জীবনে এ রকম আবেগ বিহ্বল

.....রকেট থেকে মাটিতে নামবার ফলেই বেশ হাল্কা লাগছিল।

হইনি। হলাম সেদিন। সেই মুহূর্তে। মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে বিশাল বেটেলগুজ সূর্য। যেন বিরাটকায় লাল বেলুন। নিচে ঝকঝক করছে ভিজে বালি। বালির ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা ছাপ।

মানুষের পায়ের ছাপ!

"মেয়েলী পায়ের ছাপ", বললে আর্থার।

বলল অবরুদ্ধ কণ্ঠে। অবাক হলাম না মোটেই। আমারও তাই বিশ্বাস। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পদচিহ্নটা বিলক্ষণ বিচলিত করেছিল আমাকেও। নিঃসন্দেহে মানুষের পায়ের ছাপ। হয়ত সে কিশোর অথবা খর্বকায়। আমার কিন্তু মনে হল, মেয়েছেলে।

নিজের মনেই বললেন প্রফেসর—'মানুষ তাহলে আছে এখানে।'

যেন হতাশ হয়েই বললেন। মানুষকে এড়িয়ে চলতেই এসেছেন এত দূরে। ক্ষোভটা প্রকট হল গলার স্বরে। আমার কিন্তু ভাল লাগল না কথাটা। চেয়ে রইলাম বালির দিকে। আরও পায়ের ছাপ দেখলাম। একই প্রাণীর পদচিহ্ন। লেকের পাড় থেকে দূরে সরে গেছিল আর্থার। আঙুল তুলে দেখাল শুকনো বালি। পায়ের ছাপ সেখানেও পড়েছে। কিন্তু ভিজে ভিজে।

'পাঁচ মিনিটও হয় নি, হেঁটে গেছে এখান দিয়ে,' সবিস্ময়ে বলল আর্থার।

'স্নান করছিল নিশ্চয়। আমাদের দেখেই পালিয়েছে,' বললাম আমি।

সে যে মেয়েছেলে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না মনে। নীরবে চেয়ে রইলাম জঙ্গলের পানে তাকে দেখার আশায়। পত্রমর্মরই শুনে গেলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন প্রফেসর—'পায়ের ছাপ যার, তাকে পরে খুঁজলেও চলবে। সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। স্নান করে নিলেই তো হয়।'

তিরিক্ষে কণ্ঠস্বর। বলতে বলতে জামাকাপড় খুলছিলেন। অন্তর্বাস পরে ঝাঁপ দিলেন জলে। দিলাম আমরাও। দুবছর পর এই প্রথম প্রকৃত অবগাহন। শরীর মন জুড়িয়ে গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। জলের ধারা যেখানে চ্যাটালো হয়ে প্রপাতের আকারে ঝরে পড়ছে, সেইখানে, চওড়া সেই পাথরটার ওপর, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মেয়ে।

মনের ওপর সেদিন যে ছাপ পড়েছিল, জীবনে তা ভুলব না। অপরূপ দৃশ্য। সোরোর গ্রহের প্রথম মানুষকে দেখলাম এবং হতবাক হয়ে গেলাম। কুচোজল ছিটকে গিয়ে লাগছে তার সোনালী শরীরে। টকটকে লাল বেটেলগুজ সূর্যের রক্তকিরণে ঝকমক করছে গোটা শরীরটা। যেন একটা ডানাকাটা পরী। বয়স খুব কম। গায়ে গয়না একদম নেই। মাথার লম্বা চুল লেপটে রয়েছে বুকে পিঠে। পরনে গাছের ছালের বদখৎ পোশাক। কিন্তু সৌন্দর্য তাতে ঢাকা পড়েনি। পাথরের ওপর পাথরের মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম আমি আর আর্থার। চোখের পাতা ফেলতে পারলেন না প্রফেসরও।

গায়ের রঙ তার সোনালী—রোদেপোড়া তামাটে নয়। শিশুর মত সরল মুখ। নিষ্পাপ। কিন্তু তার চোখ?

শিউরে উঠলাম চোখ দেখে। সামান্য খুসর। কিন্তু চাহনি একেবারেই অন্যরকম। পৃথিবীর কোনো মানুষের চোখে এমন চাহনি দেখিনি। অন্য গ্রহের মানুষের চোখে অন্যরকম চাহনি থাকা বিচিত্র নয়। তবুও শিউরে উঠলাম আমি। শূন্য চাহনির মধ্যে কোনো রকম ভাবের প্রকাশ নেই। পাগলের চাহনিও এমন হয় না। এ চাহনিকে অমানুষিক চাহনিও বলা যায় না। গা শিরশির করে উঠল আমার।

চোখে চোখে চেয়েছিলাম। মেয়েটা প্রথমে বুঝতে পারে নি। আমরাও যে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, টের পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হতেই চোখ সরিয়ে নিল চকিতে। ভয় পাওয়া পশুর মত। চমকে উঠেছে যেন। লজ্জা পেয়েছে বলে নয়। কেন জানি মনে হল আমার, লজ্জাজাতীয় অনুভূতি মেয়েটার মধ্যে নেই। চোখে চোখে চেয়ে রয়েছি, এটাই যেন সইতে পারল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও কিন্তু আড়চোখে দেখতে লাগল আমাদের।

মৃদুস্বরে বলল আর্থার—'বলেছিলাম না, পায়ের ছাপটা মেয়েছেলের।'

খুব আস্তে কথাটা বলেছিল আর্থার। কিন্তু শুনতে পেল মেয়েটা। গলার আওয়াজটাই যেন অদ্ভুতভাবে সিঁটিয়ে দিল তাকে। আবার দেখা গেল ভয়ার্ত পশুর মত পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। ছিটকে পেছিয়ে গেল বটে, বড়সড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে শুধু মাথা আর চোখ বার করে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইল আমাদের দিকেই।

ভয় পেয়েছে। পালিয়ে যেতে পারে। তাই আঙুল পর্যন্ত নাড়ানোর সাহস হল না আমাদের। দেখে মেয়েটাও সাহস ফিরে পেল। একটু পরেই ফের পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে। দাঁড়াল চ্যাটালো পাথরটার কিনারায়। আর্থার ছোকরা কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারল না।

বলেছিল—'কী আশ্চর্য!'

সঙ্গে সঙ্গে আবার সিঁটিয়ে গেল মেয়েটা। মানুষের গলার আওয়াজ যেন আতঙ্ক তার কাছে।

ইশারায় আমাদের চুপচাপ থাকতে বললেন প্রফেসর। জল ঠেলে এগিয়ে গেলেন পাড়ের দিকে মেয়েটার দিকে একদম না চেয়ে। আমরাও তাই করলাম। কাজ হল তাতে। আবার সামনের দিকে গুটিগুটি এগিয়ে এল মেয়েটা। এবার শুধু এগিয়ে আসাই নয়, আমাদের জল ঠেলে এগিয়ে যাওয়াটা যেন রীতিমত আগ্রহের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আগ্রহটা কিন্তু অস্বাভাবিক

ধরনের। অন্তত আমার তাই মনে হল। কৌতূহলও বেড়ে গেল সেই কারণে। জলে নামতে চাইছে, আমাদের পাশে আসতে চাইছে, অথচ সাহসে কুলোচ্ছে না। দুপা এগিয়ে এল। আবার দুপা পিছিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। দুহাতে পাথর খামচে ধরল। অদ্ভুত!

আচমকা শুনলাম তার গলার আওয়াজ। সে আওয়াজ পশুর গলার আওয়াজের মতই। হঠাৎ সটান উঠে দাঁড়িয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়ার ভঙ্গিমায় রয়েছে, দেখেছিলাম আড়চোখে। আওয়াজটা করল গলার মধ্য দিয়ে। ঈষৎ হাঁ করে। জিভ নড়ল না। ঠোঁট নড়ল না। শুধু একটা আওয়াজ। চিড়িয়াখানায় ফুর্তির চোটে শিম্পাঞ্জীরা যেভাবে শব্দ করে, ঠিক সেইভাবে।

তারপরেই সড়সড় করে হাতেপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নেমে এল পাথরের গা বেয়ে লেকের জলের ধারে। হাঁটু গেড়ে বসে রইল একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর কিছুক্ষণ। চোখ আমাদের দিকেই। পরক্ষণেই ঝাঁপ দিল জলে। সাঁতরে এল আমাদের দিকে।

শুরু হল সাঁতারের খেলা। সে কখনও এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। কিন্তু আমরা এগিয়ে গেলেই পালিয়ে যায় তফাতে। একেবারেই ছেলেমানুষী ব্যাপার! প্রফেসরও দেখলাম ব্যাপারটায় বেশ মজা পেয়েছেন। খেলা জুড়েছেন মেয়েটার সঙ্গে।

অবাক হলাম আরও একটা ব্যাপারে। অস্বস্তিও বলা যায়। মেয়েটাও যে বেশ মজা পাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হাসছে না। না মুচকি হাসি, না খিলখিল হাসি। ভাবলেশহীন মুখ। মাঝে মাঝে কেবল গলা দিয়ে বার করছে খুশির আওয়াজ!

মাথায় একটা মতলব এল। এক্সপেরিমেণ্টের মতলব। মেয়েটা কাছাকাছি আসতেই চাইলাম চোখে চোখে। হাসি ফুটিয়ে তুললাম চোখে মুখে। স্নেহের হাসি। বন্ধুর হাসি।

ফল হল অদ্ভুত। অবাক করে দেওয়ার মত। সটান দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু হাত ওপরে তুলল আত্মরক্ষার ভঙ্গিমায়। তারপরেই পেছন ফিরে উঠে গেল জল থেকে। থমকে দাঁড়াল আবার। শরীরটাকে অর্ধেক মোচড় দিয়ে আড়চোখে চেয়ে রইল আমাদের দিকে। ভয় পাওয়ার বস্তু দেখলে জন্তু-জানোয়াররা যেমন করে, ঠিক সেইভাবে। একটু পরেই অবশ্য সাহস ফিরে পেল আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে দেখে। ওর দিকে না চেয়ে আমি সাঁতরাতে লাগলাম অন্য দিকে। এরপরেই যা ঘটল তা ভাবিয়ে তুলল আমাদের তিনজনকেই।

আওয়াজ শুনলাম জঙ্গলের মধ্যে। হেকটর ফিরে আসছে। ডাল থেকে ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। মাটিতে লাফ দিয়েই হেলেদুলে দাঁত বার করে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

মেয়েটার মুখে পাশবিক পরিবর্তনটা দেখা গেল সেই মুহূর্তে। হেকটরকে দেখেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েই জিঘাংসা ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে। সাঁৎ করে পিছু হটে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল পাথরের আড়ালে। দু হাতের আঙুলগুলো দেখলাম বেঁকে শক্ত হয়ে গেছে - যেন শ্বাপদের থাবা। শিরদাঁড়া টানটান। প্রতিটি পেশী কঠিন। সামান্য একটা শিম্পাঞ্জীকে দেখে কেন যে এই পরিবর্তন, তা ভেবে পেলাম না।

মেয়েটাকে দেখতে পায়নি হেকটর। পাথরটার পাশ দিয়ে আসছিল আমাদের দিকে। আচমকা ধনুকের মত শরীর বেঁকিয়ে ফেলল মেয়েটা। ছিটকে বেরিয়ে গেল পাথরের আড়াল থেকে। খপ করে টুঁটি টিপে ধরল হেকটারের। দুই উরুর মাঝে চেপে ধরল দেহটা। আক্রমণটা ঘটল এত চকিতে যে বাধা দেওয়ার সময়ও পেলাম না। হেকটর যেন ষাঁতাকলে পড়ে ধস্তাধস্তি পর্যন্ত করতে পারে নি। সেকেণ্ড কয়েক আড়ষ্ট হয়ে থেকে লুটিয়ে পড়ল নিষ্প্রাণ দেহে মেয়েটা তাকে ছেড়ে দিতেই। নিরীহ পোষা শিম্পাঞ্জীটাকে এইভাবেই খুন করল যে, মনে মনে তার নাম দিয়েছিলাম নোভা—ঝকমকে তারা নোভার মতই অপরূপা বলে।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেই তেড়েমেড়ে ধরতে গেছিলাম নোভাকে। হেকটরের দিকে নয়। সে তো মরে গেছে। মেয়েটা কিন্তু ফের রুখে দাঁড়াল দুহাত সামনে বাড়িয়ে ধরে আত্মরক্ষার ভঙ্গিমায়। পশুর মতই বেঁকে গেল ঠোঁটদুটো। দেখেই দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা। নোভার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার—বিজয় উল্লাস আর আতীব্র ঘৃণা মিশানো ভয়াবহ চিৎকার। পরক্ষণেই তীরবেগে পালিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। দেখতে দেখতে গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল সোনালী শরীরটা। আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল অরণ্য। আগের মতই।

[আগামী সংখ্যায় ঃ বন থেকে বেরোলো বর্বর]

পরমাণু বোমা ও তার ভয়াবহতা

দীপাঞ্জন মিত্র

সমস্ত পৃথিবী আজ পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকায় দিশাহারা। আধুনিক সভ্যতার পক্ষে এ এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু, কি এই পারমাণবিক শক্তি? কেনই বা এর এত ভয়াবহতা?

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদারফোর্ড, নীলস্ বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন—মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন সত্তাহীন কণা পরামণুও বিভাজ্য; নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন দিয়ে পরমাণু তৈরি। পরমাণুর সবচেয়ে ভারী ও সুস্থিত অংশ নিউক্লিয়াস নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত, আর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। কিন্তু, প্রকৃতিতে কতকগুলি মৌল আছে (যেমন, ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম, থোরিয়াম) যেগুলি ক্রমাগত α (আলফা) β (বিটা) ও γ (গামা) নামে তিনপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে এক মৌল হতে অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ, এদের নিউক্লিয়াস সুস্থিত নয়। ঐ সকল মৌলগুলিকে বলে তেজস্ক্রিয় মৌল ও রশ্মিগুলিকে বলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি (radio-active rays)। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে α ও β রশ্মি অতি ক্ষুদ্র কণার স্রোত হলেও γ রশ্মি একপ্রকার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম। সুতরাং, γ রশ্মির বিকিরণ মানেই শক্তির বিকিরণ।

তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে এক মৌল হতে পরবর্তী মৌলে রূপান্তরিত হয়। ফলে মোট ভর হ্রাস পায় কিন্তু শক্তির আকারে γ রশ্মি বেরিয়ে আসে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস শক্তির আধার এবং এই শক্তি তারা কাজে লাগানরও চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু, তারা শক্তি উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। পরে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত $E=mc^2$ (E=উৎপন্ন শক্তি, m=রূপান্তরিত ভর, c=আলোকের গতিবেগ) সূত্রের সাহায্যে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে বলেন, এক মৌল হতে অন্য মৌলে রূপান্তরিত হবার সময় হ্রাসপ্রাপ্ত ভরই পরিবর্তিত হয়ে শক্তির উদ্ভব ঘটায়। কোন অপেক্ষাকৃত ধীরগতির নিউট্রন দিয়ে U-235 এর নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি বেরিয়াম এবং ক্রিপটনের নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায় এবং 200 MeV শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাকে নিউক্লিয় ফিসন বলে। [U^{238} ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ]

$$_{92}U^{235} + {}_0n^1 \longrightarrow {}_{56}Ba^{142} + {}_{36}Kr^{91} + {}_0n^1 + 200\ MeV.$$

এই নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাও আবার বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ শৃংখলাকারে নিউক্লিয় ফিসন চলতে থাকে এবং প্রতিবারই প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তিই পারমাণবিক শক্তি।

পারমাণবিক শক্তিকে প্রতিরক্ষার কাজে লাগানর জন্যে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে পারমাণবিক বোমা যা আজ সমস্ত পৃথিবীর আতঙ্ক। পারমাণবিক বোমাতে শৃংখলাকার নিউক্লিয়ার ফিসন ঘটান হয় বলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ কালে শুধুমাত্র প্রচণ্ড শক্তিরই উদ্ভব ঘটে না, বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মিও বেরিয়ে আসে যা জীবদেহে কেবল রোগেরই সৃষ্টি করে না, জীবকুলকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে তোলে। তাছাড়া, এর প্রভাব শুধু তাৎক্ষণিকই নয়, বিস্ফোরণের বহু বহু বছর পরেও এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন উত্তপ্ত গ্যাস দ্বারা তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি আকাশে বাহিত হয়ে পারমাণবিক মেঘ আকারে অবস্থান করে। পরে, বৃষ্টির সঙ্গে মৌলগুলি মাটিতে ও জলে জমা হয়। ঐ জল পান করার ফলে মৌলগুলি আবার বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদও মাটি হতে জল ও খনিজ লবন শোষণের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলিও শোষণ করে। মানুষ ঐ সব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাওয়ার ফলে তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো

সবশেষে মানুষের দেহেই আসে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি কিন্তু দেহের মধ্যেও তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ মানবদেহের জননকোষ ও দেহকোষ উভয়কেই প্রভাবিত করে। এর তাৎক্ষণিক প্রভাবে সমস্ত দেহকোষে এক অদ্ভুত জ্বালা হয়, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হয়, অস্থিমজ্জা নষ্ট হয়ে যায় বলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হতে পারে না, ফলে অ্যানিমিয়া ও লিউকোমিয়া রোগ দেখা দেয়। রক্তের গ্রানুলোসাইট ও লিম্ফোসাইট নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য লিউকোপেনিয়া রোগ দেখা দেয় ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় বা নষ্ট হয়ে যায় ও দেহে বিভিন্ন রকম রোগের সংক্রমণ ঘটে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি গর্ভাবস্থায়, (বিশেষ করে প্রথম কয়েক মাস) অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ তেজস্ক্রিয় রশ্মির জন্য ঐ ভ্রূণজাত শিশুর শৈশবাবস্থায় এমন সব রোগের সৃষ্টি হয় যা ঐ শিশুকে বিকলাঙ্গ বিকৃতাঙ্গ বুদ্ধিহীন জড়ভরত করতে পারে, এমন কি, মেরেও ফেলতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর γ রশ্মি। এই রশ্মি দেহের কোষ-কলাকে পুড়িয়ে দেয় (নিউরোসিস রোগ) দেহকোষের মাইটোসিস বিভাজন বন্ধ করে। ফলে দেহের কাজকর্ম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়, পৌষ্টিকতন্ত্রে বিভিন্ন উৎসেচক ঠিকভাবে ক্ষারিত হয় না, বমি বমি ভাব, পেটখারাপ, পৌষ্টিক নালীতে ক্ষত প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। γ রশ্মি শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের জননমাতৃকোষের এবং দেহকোষেরও জিনসজ্জাকে ভেঙে ফেলে এক নতুন ধরনের জিনসজ্জার সৃষ্টি করে অর্থাৎ এককথায় মিউটেশান ঘটায়। এই ধরনের মিউটেশান জীবিত কোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে যেমন ক্যান্সার রোগ দেখা দেয় তেমনি বিকৃতাঙ্গ, বুদ্ধিহীন সন্তান জন্মেরও আশঙ্কা থাকে।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক ফলাফলও কম ভয়াবহ নয়। এ প্রসঙ্গে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফল স্মরণ করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের সদস্য MarCel Junod এর ভাষায়—'পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন প্রচণ্ড আলো ও শব্দে বহুলোকের অন্ধত্ব ও বধিরতা দেখা দেয়, প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল 3-5 কিমি এর মধ্যে অবস্থিত সকল জীব, বাড়িঘর, উদ্ভিদ ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়—পারমাণবিক ঝড় ও বৃষ্টি।' অতীতের সেই দুষ্কার্যের ভার আজও বহন করে চলেছে ঐ অঞ্চলের নিরীহ বিকৃত প্রজন্মের নাগরিকেরা।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে শুধুমাত্র আক্রান্ত দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় ভস্ম বায়ু মাধ্যমে বাহিত হয়ে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে সামগ্রিক ভাবে পরিবেশের তেজস্ক্রিয় মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। ফলে অন্যান্য অঞ্চলেও ক্যান্সার ও তেজস্ক্রিয়তা ঘটিত অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাবে। এই কারণেই পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষ আতঙ্কিত। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনাও প্রচুর। বর্তমান দিনের ব্যাপক শক্তি চাহিদার অনির্বাণ উৎস হিসাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক। মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করলে পারমাণবিক শক্তি মানব সভ্যতাকে দেবে বিস্ময়কর উন্নতি। তাই, আজ কিছু শান্তিকামী বিজ্ঞানীর অবিরাম প্রচেষ্টা পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলিকে বুঝিয়ে অসীম সম্ভাবনাময় পারমাণবিক শক্তি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা; 'যুদ্ধ নয় শান্তি'—এই তাদের মূলমন্ত্র।

335 লেকটাউন, ব্লক-'এ', কলি-৭০০০৪৯

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
অমরনাথ রায় প্রণীত
স্টুডেন্টস্ নলেজ গাইড (১ম ও ২য়)
প্রথম খণ্ড : VI—VIII—10 থেকে 14 বছর বয়সের জন্য
দ্বিতীয় খণ্ড : IX—X—14 থেকে 16 বছর বয়সের জন্য
প্রতি খণ্ড 12 টাকা
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স্

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপুর ছেলেবেলা ১০·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা বিচিত্রা ২০·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের অপরাজিত ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান ২৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামধনু ১০·০০

ভ্রমণ রহস্য ও অভিযান

সুনির্মল বসু

রোমাঞ্চের দেশে ৬·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধর

দুরন্ত যাত্রী ৮·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গঙ্গা যমুনা ৫·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমাজনের অরণ্যে ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

কিশোর রচনাবলী

জগদীশ চন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫·০০

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

মেঘনাদ সাহা

কিশোর রচনা সঙ্কলন ১১·০০

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

শার্লক হোমস-এর

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর রচনা সমগ্র ৩০·০০

অঙ্কুর থেকে মহীরুহ

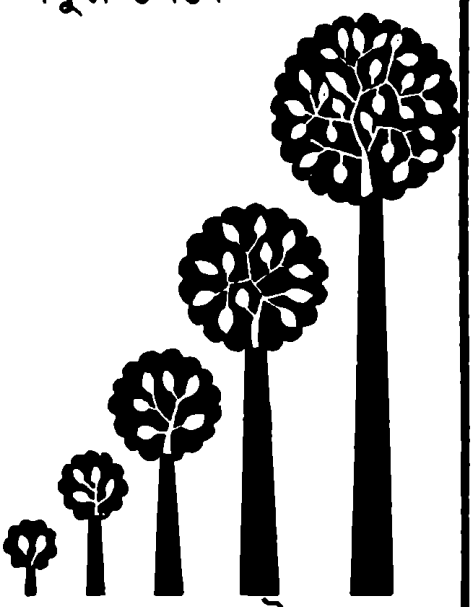

আপনাদেরই
সক্রিয় সহযোগিতায়

উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের একেবারে
মনের মত বই
বইটিকে সার্থকতার তীরে নিয়ে যেতে
সাহায্য করেছেন

আপনি

এবং আপনার মত চিন্তাশীল শিক্ষকেরা।

ডঃ অলক চক্রবর্তী ও ডঃ হরিনারায়ণ কুণ্ডু

রচিত

পদার্থবিদ্যা (১ম ও ২য়) খন্ড

উচ্চ মাধ্যমিক/জয়েন্ট ও আই· আই· টি· এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর—এছাড়া হাজার খানেক কষা অংক/শ'দুই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিনব সংস্করণ।

দি নিউ বুক স্টল

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পোঃ বক্সঃ 10836• গ্রাম BHALOBOI

মাছেদের ভাষা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

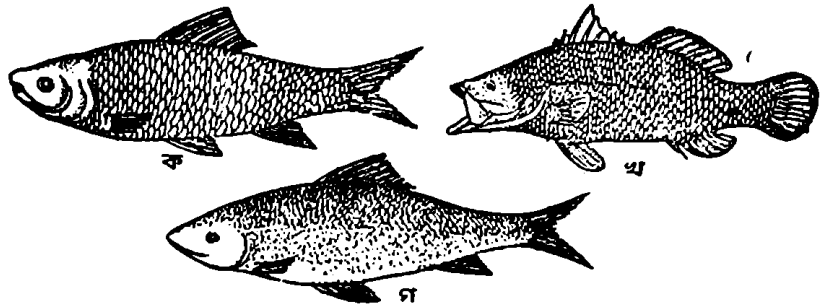

মাছেদের তো কোন স্বরযন্ত্র নেই। তাই ভাবা হয় মাছেরা মূক। যদিও অনেক মাছকেই জল থেকে ডাঙ্গায় তুললে দেখা যায় যন্ত্রণা কাতর শব্দ করছে। বা ভাবা হয় বুঝি মৃত্যুপথযাত্রী মাছেদের খাবি খাওয়ার শব্দ। স্বাভাবিক জীবনে যে শব্দ করতে তারা অক্ষম।

কিন্তু না, জলের তলার শব্দ গ্রহণ করার উপায় আবিষ্কারের পর জানা গেছে, মাছেরা প্রায় সকলেই মুখর। বিভিন্ন জাতের মাছ পারে বিভিন্ন রকমের শব্দ সৃষ্টি করতে। যেমন গোঁ গোঁ, হিস্ হিস্, কট মট।

মাছেরা শব্দ সৃষ্টি করে প্রধানতঃ দুভাবে। এক, তাদের পেটের ভেতরের বায়ুথলি বা পটকাকে কাঁপিয়ে কী সঙ্কুচিত করে। তার ভেতরের হাওয়াকে নিষ্ক্রান্ত করে। এবং দুই, তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঘর্ষণ করে।

পটকাকে সঙ্কুচিত করতে প্রয়োজন 'সোনোরিফিক' পেশীর। যা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় মাইক্রোপোগাস অ্যাণ্ডুলেটস জাতীয় মাছেদের পেটে।

পটকাকে সঙ্কুচিত করে মাছেরা যে শব্দ সৃষ্টি করে তারচেয়ে অনেক বেশি তীব্র সৃষ্টি করতে পারে ওদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে।

ট্যাংরা, কোটাসস্কোরপিয়াস, বোয়ার, স্টিকেল ব্যাক জাতের মাছেরা শব্দ সৃষ্টি করে ওদের পেটের নিচে, সামনের দিকের 'পেকটোরাল' পাখনাটির সাহায্যে। যেটি দিয়ে তারা টোক্কা মারে ঠিক তার পাশের শক্ত হাড়ের তৈরি 'সিলথ্রাম' প্রত্যঙ্গটির ওপর। রাইনিক্যানথান এ্যাকুলিয়েটাস শ্রেণীভুক্ত ট্রেগার মাছেরা শব্দ সৃষ্টি করে তাদের শরীরের কয়েকটি হাড়কে ঘষাঘষি করে। যাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে 'পেকটোরাল' পাখনাটি। অনেক মাছ আবার শব্দ সৃষ্টি করে শুধু পাখনার হাড় ঘষে কী দাঁত কিড়মিড় করে।

মাছেরা শব্দ সৃষ্টি করে প্রধানতঃ জীবনধারণের প্রয়োজনেই। যেমন, প্রজননের তাগিদে, স্ত্রী মাছকে পুরুষ মাছ তার কাছে পেতে। সমুদ্রের গভীরে, গাঢ় অন্ধকারে শত্রুকে আক্রমণ কি ভয় দেখাতে চেয়ে স্বজাতীর মাছেরা দল বাঁধতে চেয়ে ইত্যাদি। মাছেরা যে শব্দ করতে সক্ষম একথা প্রথম অনুমান করেছিলেন ইংলণ্ডের মৎস্যবিদ্ মিঃ এম পি ফিজ—1954 সালে। যা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

3C, ব্রনফেল্ড রো, কলকাতা-27

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন প্রণীত
ক্যুইজ বুকস্ সিরিজের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ

লাইফ্ সায়েন্স ক্যুইজ ॥ ১০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বর্ণরূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার

যা বলেছো ! তবে উল্কা হয়তো নয়। মনে হচ্ছে-একটা চোঙ। ভিতরে মঙ্গলগ্রহের মানুষও মনে হয় রয়েছে।
ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেলেন দু'জনে।
দেখো, দেখো, চোঙের মাঝখানে একটা ঢাকা। চকচক করছে। বাতাস ঢুকছে ভিতরে।
...সোঁ৩৩৩৩...
চোঙটার উপর একটা লাঠি দিয়ে বারবার আঘাত করলেন হ্যাওয়ারসন।
নাহ, কোন সাড়া নেই। ওরা বোধহয় মারা গেছে সবাই। যা গরম!
সকালের কাগজেই খবরটা আমার চোখে পড়লো।
মঙ্গলগ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসে পড়েছে। দুঃখের কথা - তারা কেউ বেঁচে নেই।
খবরটা পেয়েই আমি ছুটলাম।
চোঙের ভিতর মাঝে মাঝে মৃদু কম্পন এখনো শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ঢাকনা খোলা যাচ্ছে না।
বাহ, অনেকখানাই বের করেছো দেখছি। কী মনে হচ্ছে এগিলডি?
...ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ...
সন্ধ্যার দিকে আপনা থেকেই ঢাকনাটা খুলে গেল।
6

ওই দেখো ওগিলভি – ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে। কী যেন একটা কুত কুত করে আমাদের দেখছে।
হা ভগবান! এ কী? মঙ্গলগ্রহের জীব? কী কিম্ভূতকিমাকার দেখতে। হাতির মতো শুঁড়, চোখের ভ্রূ নেই…
…আঁ আঁ আঁ আঁ…ঙ-ঙ!…
হাপরের মতো হাঁসফাঁস করছে জীবটা। অনভ্যস্ত পরিবেশে পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচবার চেষ্টা করে যাচ্ছে এখনো। ঐ যাঃ, পড়ে গেল জীবটা। মারা পড়লো মনে হয়। বেচারা!
আরো খানিক পর…
আশ্চর্য! একটা সরু নল, অল্প অল্প উঠে আসছে যানটার ভিতর থেকে।
মাথার দিকে গোলাকার একটা আয়না। ওটা দোল খাচ্ছে, ঘুরছে। কী ওটা? কী করছে?
সাদা নিশান হাতে এবার এগিয়ে গেল ছোট্ট শান্তিকামীর দল। ওগিলভি আর হ্যাণ্ডারসন ওদের মধ্যে।
আহ, মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা এবার বুঝতে পারবে – মানুষও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তারা যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি।
একি! আগুনের হলকা! একটা পীতাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী বায়ুস্তর ভেদ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর দীপ্তি!
7

হঠাৎ--
--হিসসস--
ডোমের উপর থেকে একটা ডিম্বাকার বস্তু উপরে উঠে এলো।
আর তখনি--
আগুন, আ-গু-ন! মারণরশ্মি ছুটে আসছে। পালাও-পালাও--আঁ আঁ আঁ--
উঃ- কী ভয়ংকর মৃত্যুলীলা!
ওঃ, ভাগ্যিস দূরে ছিলাম আমি। আগুনের রশ্মিতে সব মুহূর্তের মধ্যে ছাই হয়ে গেল।
উঃ, পা আর চলছে না। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে। আমি কেমন করে বাঁচবো। ঐ-ঐ এগিয়ে আসছে সেই ভয়ংকর মারণরশ্মি।
একি! হঠাৎ যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আঃ, সেই শিখাটা আর নেই। কিন্তু সেই বীভৎস প্রাণীগুলো? ওরা কোথায়? কতোদূরে?
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি ছুটলাম।
হুঁশিয়ার! মঙ্গলের জীবগুলো এই পথেই আসছে।
আঃ, এসে পড়েছি বাড়ীতে। আর বোধহয় ভয় নেই।
8

কির বুলিশেভ

অনুবাদ: চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

সকালবেলা মানমন্দিরে বসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ সামনের রেডার স্ক্রীনে 'বিপ্ বিপ' শব্দ করে একটা আলো জ্বলে ওঠায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা কালো রঙের বিরাট গোলাকৃতি মহাকাশযান প্রচণ্ড বেগে আমাদের এই ছোট্টো গ্রহটার বুকে আশ্রয় নিতে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম ফেলে বাইরে বেরিয়ে দেখি, অসংখ্য মানুষ সেখানে জমায়েত হয়েছেন যানটাকে দেখতে। প্রচণ্ড বেগে নেমে আসার সময় ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সংঘর্ষে যানটা থেকে কালো কালো কতকগুলো টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো অনেক দূরে। একসময় আস্তে আস্তে যানটার গতি কমে এলো এবং একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেটা নিশ্চল হয়ে গেল। অত্যুৎসাহী গ্রেন আমার হাত ধরে সবচেয়ে আগে ঐ যানটার কাছে পৌঁছে গেল। যানটাকে দেখতে ঠিক যেন একটা ফেটে যাওয়া কালো রঙের ডিমের মতন। আগাগোড়া চকচকে কালো ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া, নানা জায়গায় সিলিণ্ডারের মতো কিসব ঝুলছে। এক জায়গায় ভাঙাচোরা একটা ডায়ালের মতো কি একটা দেখতে পেলাম। মনে হয় ওইটাই ছিল যানটির কণ্ট্রোল রুম।

ইতিমধ্যে মানমন্দির থেকে আরো অনেকে বেরিয়ে এসে খোঁজাপাতি শুরু করে দিয়েছেন। চারদিকে ডিটেক্টর দিয়ে অনুসন্ধান চালাতে চালাতে হঠাৎই যানটি থেকে প্রায় 50 মিটার দূরে আপাদমস্তক স্পেসসুটে ঢাকা, চকচকে একমাথা সাদাচুলের একটি মেয়েকে আবিষ্কার করলাম। সম্ভবত দুর্ঘটনার সময় সে ছিটকে যানটি থেকে বাইরে পড়ে গিয়েছিল। দারুণ উত্তেজনায় তক্ষুনি আমরা তাকে মানমন্দিরের ছোট্ট হসপিটালে নিয়ে গেলাম। আমাদের উৎসাহ ও উত্তেজনাকে নস্যাত করে দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'মেয়েটি এখনো জীবিত আছে কিন্তু মর্ত্যবাসীরা কোনো ভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারবে না—যেহেতু সে একটি তুষার কন্যা।' ডাক্তারবাবুর হেঁয়ালিভরা কথায় অধৈর্য হয়ে উঠলাম। তখন তিনি পুরো ব্যাপারটি খোলসা করে বললেন যে, পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণের ভিত্তি হলো জল, কিন্তু ভিনগ্রহী এই মেয়েটির ভিত্তি হলো এ্যামোনিয়া—পৃথিবীর আবহাওয়ায় যার স্ফুটনাঙ্ক হলো ;—33° সেণ্টিগ্রেড আর হিমাঙ্ক—78° সেণ্টিগ্রেড। অর্থাৎ মেয়েটির মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে নিলেই সে একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে পরিণত হবে। দেড় ঘণ্টা ধরে যানটার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা এ্যামোনিয়ার সিলিণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেল। অবশেষে মেয়েটিকে বাঁচানো সম্ভব হল। হাসপাতালের দুমিটার বাই তিন-মিটার সেলে বন্দিনী মেয়েটির সঙ্গে কেমনভাবে জানি না আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রতিদিন মেয়েটির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করি, তাকে আমাদের পৃথিবীর

নানারকমের ছবি দেখাই, আমাদের গ্রহের মানুষ, জীবজন্তুর কথা শোনাই। সেও নানা মজার কথা বলে ট্রান্সলেটার মেশিনের সাহায্যে খুব ঠাণ্ডা গলায়। তার ইংরেজী 'Y' আর 'W' হরফদুটোকে খুব মজার মনে হয়। মাঝে মাঝে আমি বললে সে নিজের আসল গলায় কথা বলে। কিন্তু বেচারীর শব্দ ভাণ্ডার বড়োই সীমিত। একে একে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। তুষার কন্যার সঙ্গে এক মানসিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম আমি। আমার সম্পর্কে সেও কৌতূহলী হয়ে উঠল। দিনান্তে সে একবার আমায় দেখতে চাইত--আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে নানা রকমের প্রশ্ন করত।

তার চোখদুটি কিন্তু ভারী অদ্ভুত। ঢেউয়ের রঙ বদলের মতন ক্ষণে ক্ষণে তাতেও রঙবদল হত। আনন্দের সময় তার চোখদুটি চকচকে নীল, দুঃখের সময় ধূসর আর রাগ হলে সবুজ হয়ে যেত। তবে তার নীল চোখদুটিই আমি সবচেয়ে পছন্দ করতাম। তার অনুরোধে বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও একদিন স্পেসসুটের কাঁচের ঢাকনির ওপর দিয়ে তাকে স্পর্শ করলাম।

* * * *

অবশেষে বিদায়ের দিন এসে গেল। সকাল থেকেই তুষার কন্যা ভারী উত্তেজিত। স্পেসসুটটা বার বার পরীক্ষা করে দেখছে। সিলিণ্ডারগুলোও পরীক্ষা করছে। একসময় আমাদের পেট্রল জাহাজটা তুষার-কন্যার বাসস্থানে, এক ভিনগ্রহের মাটিতে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর দিয়ে হাল্কা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল—যানটি থেকে প্রায় 30 মিটার দূরে একটা নিচু মেশিন ঘিরে, ফ্ল্যাগ স্টানের আশেপাশে বহু লোক অপেক্ষা করছে তুষার কন্যার জন্যে। তারা কেউই কিন্তু স্পেসসুট পরেনি। পেট্রল জাহাজ থেকে নেমে তুষার কন্যা আমার পাশ দিয়ে দূরে দাঁড়ানো মানুষদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। ভীড়ের মধ্যে থেকে এক মহিলা দৌড়ে তার দিকে আসতে শুরু করলেন। সেই মহিলার কাছাকাছি পেঁছে তুষার কন্যা হেলমেটটা খুলে ফেলে দিল। মাথার চুলে হাত চালিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎই আমাদের জাহাজের দিকে তার চোখ পড়ল। মহিলাকে কিছু বলে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে নিজের গ্লাভসগুলো খুলে আমাকেও অনুরোধ জানালো গ্লাভস খুলতে। গ্লাভসখোলা হলে তুষার কন্যা দুটি হাত দিয়ে আমার বলিষ্ঠ ডানহাতটা তুলে নিজের মুখে একমুহূর্তের জন্যে চেপে ধরল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলাম, কিন্তু ততক্ষণে তার গালে আমার হাতের বেগুনি রঙের ছাপ পড়ে গেছে। পোড়া জায়গাটায় হাত বুলিয়ে তুষার কন্যা হেসে বলল, 'ও কিছুই না—সেরে যাবে, আর যদি না যায় তাহলে আরো ভাল। মর্তের মানুষ তুমি, তোমার হাতের স্পর্শ থেকে যাবে চিরদিনের জন্যে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তার অতল-স্পর্শী চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে সে ফিরে গেল তার আপনজনদের কাছে। আমার গ্লাভসখোলা ডানহাতটায় জড়িয়ে রইল কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি—তুষার কন্যার স্পর্শ— তার বিদায় বার্তা।

(কির বুলিচেভ-এর সেনা গার্ল গল্পের সারানুবাদ)

21,1, রসা রোড (সাউথ) থার্ড লেন, কল-33

২৪ ঘণ্টায় একদিন কেন ?

শ্যামাপদ দাস

হঠাৎ যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা, 24 ঘণ্টায় একদিন হয় কেন ?' উত্তরটা নিশ্চয়ই চটপট দিয়ে ফেলা যাবে—'পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে একবার পাক খেতে 24 ঘণ্টা সময় লাগে বলেই একদিনের মেয়াদ 24 ঘণ্টা।' প্রশ্ন এবং উত্তর—দুটোই বেশ সোজা। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এ রকমের হয়—'নিজ অক্ষের চারপাশে একবার পাক খেতে পৃথিবীর ঠিক 24 ঘণ্টা সময়ই লাগে কেন ? কিছু কম বা কিছু বেশি সময়ও তো লাগতে পারত ?' এ প্রশ্নে কেউ কেউ একটু বিব্রত বোধ করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সঠিক উত্তর খোঁজার জন্য পরিস্থিতিটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

জন্ম লগ্ন থেকেই পৃথিবীর দুরকমের গতি। আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি। সূর্যকে কেন্দ্র করে শূন্যপথে পৃথিবী প্রায় বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অবশ্য ঠিকভাবে বলতে গেলে পৃথিবী এক উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আর সূর্য থাকে সেই উপবৃত্তের এক নাভিতে। পৃথিবীর এই গতিকে বলা হয় বার্ষিক গতি। এই পথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে আমাদের হিসেবের এক বছর। আর আহ্নিক গতির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরাকেই বলে আহ্নিক গতি।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকগণ এখন এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে জন্মলগ্নে পৃথিবীর নিজ অক্ষে একবার পাক খেতে সময় লাগত মাত্র 10 ঘণ্টা ! আর এখন সময় লাগছে 24 ঘণ্টা ! পৃথিবীও তাহলে ট্রাম-বাসের মত গতি বাড়াতে বা কমাতে পারে ! খুব অবাক হওয়ার মত কথা হলেও বৈজ্ঞানিকগণের এ ধারণার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

সমুদ্রের জোয়ার ভাটাই প্রধানত এর জন্য দায়ী। 'জোয়ার আসা' কথাটার সহজ মানে হল, সূর্য এবং চন্দ্রের মিলিত টানে পৃথিবী পৃষ্ঠে সমুদ্রের জল কিছুটা ফুলে ওঠে। ঐ টান কমে গেলে জল পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়—এটাই ভাটা। পৃথিবী পাক খাওয়ার সময় জোয়ারের ফুলে ওঠা জলের জন্য সমুদ্রের কাছাকাছি উপকূল ভাগে ঘর্ষণ জনিত এক প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর আকৃতি এবং গতির তুলনায় এই প্রতিরোধ নিতান্ত নগণ্য হলেও নিয়মিত এই বাধা পাওয়ার ফলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমশ কমছে। কমতে কমতেই আজকের এই অবস্থা—24 ঘণ্টায় একদিন।

এবার একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসবে—সমুদ্রে জোয়ার ভাটা এখনও নিয়মিতই হচ্ছে। সুতরাং পৃথিবীর আহ্নিক গতিও বাধা পাচ্ছে। তাহলে কি এমন সময় আসবে যখন পৃথিবী 25, 30 বা 50 ঘণ্টায় একবার পাক খাবে ?

সত্যি কথা বলতে কি, কিছুদিন আগেও বৈজ্ঞানিকগণ সে ধারণাই পোষণ করতেন। পরে হমবার্গ নামে এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নানা তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—না, সে সম্ভাবনা আর নেই। তার তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবী পৃষ্ঠের বিরাট বায়ুমণ্ডলও সমুদ্রের জোয়ারের মতই চন্দ্র সূর্যের যৌথ টানে আকর্ষিত হয়। এই আকর্ষণ বল ঠিক দুপুর এবং মধ্যরাত্রের দু ঘণ্টা আগে সব থেকে বাড়ে। খুব শক্তিশালী ব্যারোমিটারের সাহায্যে এই তারতম্য বোঝা যায়। বায়ুমণ্ডলে টানের এই তারতম্যই পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে সামান্য ত্বরান্বিত করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে। ধরা যাক একটা বল অনবরত ঘুরছে। প্রতিবার ঘোরার সময় যদি একই জায়গায় একই ভাবে মৃদু আকর্ষণ জনিত বল প্রয়োগ করা হয়, সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাবে, ঘুরন্ত বলের গতি আস্তে আস্তে বাড়ছে। ঘুরন্ত বলকে পৃথিবী এবং বায়ুমণ্ডলের উপর চন্দ্র সূর্যের যৌথ টানকে ঐ আকর্ষণজনিত বল ধরলে খুব সহজেই বোঝা যাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আস্তে আস্তে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অবশেষে ব্যাপারটির মধ্যে আর সামান্য একটু জটিলতা থেকে গেল। জন্মলগ্নে যখন পৃথিবীর গতি অনেক বেশি ছিল তখন বায়ুমণ্ডলের উপর চন্দ্র এবং সূর্যের যৌথ আকর্ষণ প্রতিদিন একই জায়গায় হত না। ফলে তেমন গতি বৃদ্ধি হয় নি। তখন জোয়ারজনিত গতি হ্রাস প্রাধান্য পেয়ে আহ্নিক গতি কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসেছে যে প্রতিদিন এই আকর্ষণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর একই জায়গায় অনুভূত হচ্ছে। তাই এখন গতি-বৃদ্ধিও প্রাধান্য পাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর গতি এক কারণে কমছে আবার ভিন্ন কারণে বাড়ছে। গত 100,000 বছরের এক গড় হিসেবে দেখা গেছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি এতটুকু বাড়েনি বা কমেনি। তার মানে জোয়ারের জন্য গতি হ্রাস এবং বায়ুমণ্ডলে আকর্ষণের জন্য গতিবৃদ্ধি—উভয়ে একেবারেই সমান অর্থাৎ স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আসল প্রশ্নের উত্তর মিলল তো ?

লেকচারার, গণিতবিভাগ দার্জিলিং গভঃ কলেজ, পোঃ+জেলা—দার্জিলিং।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

চুল দেখে অপরাধী নির্ণয়

মানুষের আঙুলের ছাপ দেখে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পুলিশকে অপরাধী ধরতে সাহায্য করেন। প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ছাপের মধ্যে তারতম্য থাকে। আর এই তারতম্য অপরাধী ধরতে পুলিশকে সাহায্য করে। অনেক সময় আবার দাগী অপরাধীদের হাতের ছাপ পুলিশ সংশ্লিষ্ট থানায় রেখে দেয়। খুব শীঘ্র হয় তো আঙুলের মত চুলও অপরাধী সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠবে। প্রজনন বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক মানুষের চুলের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজনের চুল অন্য জনের চেয়ে আলাদা। জীব বিজ্ঞানের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। মাদ্রাজের কাছে তারামণিতে যে মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্নাতকোত্তর সংস্থা আছে তার বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি এই তথ্য জানিয়েছেন। সেখানকার অধ্যাপক মারিমুথু জানিয়েছেন যে, মানুষের চুলের গোড়া পরীক্ষা করে অনায়াসে বলে দেওয়া যায় যে ঐ চুল পুরুষের না মহিলার। সুতরাং এই নতুন তথ্য আমাদের অপরাধী নির্ণয়ে পুলিশকে খুবই সাহায্য করতে পারে।

সবচেয়ে ছোট রেলগাড়ি

বেহুলা লখিন্দরের বাসর ঘরে সুচের মতো সরু ছিদ্র দিয়ে কালনাগিনী ঢুকে পড়ে লখিন্দরকে কামড়ে তার শরীরে বিষ ঢেলে দিয়েছিল সে কথা আমরা সবাই জানি। সুচের মধ্য দিয়ে হাতি গলে না—এটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু এই রকমই এক দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন এক সোভিয়েট শিল্পী। তিনি এমন একটা রেলগাড়ি তৈরি করেছেন যেটা মানুষের চুলের ভেতর তৈরি করা সুড়ঙ্গ দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে, শুধু একটা বা দুটো কামরাওয়ালা রেলগাড়ি নয়, এই রেলগাড়ি আছে ইঞ্জিন বাদে 14টা কামরা। অবশ্য এটা নিশ্চয়ই ছোট্ট রেলগাড়ি। কিন্তু এত ছোট যে, এই রেলগাড়ি ভালভাবে দেখতে হলে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। এত ছোট রেলগাড়ি পৃথিবীতে এর আগে কেউ তৈরি করেছেন কিনা সন্দেহ। আর শিল্পীর অদ্ভুত শখ। তাঁর শখ হল সব জিনিসেরই একেবারে ক্ষুদ্রতম সংস্করণ তৈরি করা। ইউক্রেন নিবাসী এই শিল্পীর নাম মিখাইল মাসলুকের।

স্কুল বিতাড়িত কৃতী ছাত্র

পরীক্ষায় একের পর এক ফেল করার জন্য চীনের সাংহাইতে একটা ছেলেকে বিদ্যালয় থেকে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে ছিল তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানবেন কি করে? ফেল করা ছেলে, সুতরাং কোথাও তার ঠাঁই নেই, বাড়িতেও অভিভাবকদের কাছ থেকে তাকে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হত অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 16 বছরের সেই স্কুল তাড়ানো ছেলেটাই পেল একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু সংস্কার উপায় বাৎলে দিয়ে মাও জিয়ালিং নামে ঐ ছেলেটা পেয়ে গেল আন্তর্জাতিক পুরস্কার। 1985 সালের মার্চ মাসে তাকে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার যে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাবার পর তার কদর রীতিমত বেড়ে গেল। সব স্কুলই তাকে ছাত্র হিসাবে ভর্তি করে নিতে চায়। শেষকালে জিয়াজনিং হাইস্কুলে আবার তাকে ভর্তি করে নেওয়া হল। তারই সংস্কার-মূলক শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী তাকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হল। সত্যি অদৃষ্টের কি পরিহাস!

নতুন নক্ষত্রের সন্ধান

বিজ্ঞানের রহস্যজনক আবিষ্কারের জন্য মানুষ সর্বদাই ব্যস্ত। এই বিজ্ঞানর যুগে মানুষ প্রকৃতির কত রহস্যের কুল কিনারা করেছে। আবার নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে তাঁরা মহাকাশে নতুন ধরনের 'বিস্ফোরক নক্ষত্রের' সন্ধান পেয়েছেন। এই নক্ষত্রগুলির আলো বিকিরণের পরিণাম অন্যান্য ধরনের নক্ষত্রের দ্বিগুণ।

এই আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন গ্রহের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব। এটা সূর্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমাদের নতুন আলোকপাত করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

রসায়নে যোজ্যতা

বিবেক রায়

রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে গেলে তোমাদের যে কোনও রাসায়নিক যৌগের সঠিক ও শুদ্ধ আণবিক সংকেত লেখার প্রয়োজন হবে। 'যোজ্যতা' সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এবং বিভিন্ন মৌল ও যৌগমূলকদের যোজ্যতা জানা না থাকলে কোন রাসায়নিক যৌগের শুদ্ধ আণবিক সংকেত তোমরা লিখতে পারবে না। তাই রসায়ন বিজ্ঞান পড়ুয়াদের পক্ষে যোজ্যতার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা একান্ত দরকার। এখন যদি প্রশ্ন করি, 'যোজ্যতা' কি? তাহ'লে এক কথায় উত্তর হবে, কোন্ মৌলের বা মূলকের অপর কোন মৌল বা মূলকের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা। এখন প্রশ্ন হলো, যোজ্যতাকে মাপা যাবে কি করে? রসায়ন বিজ্ঞানীরা যোজ্যতাকে মাপবার জন্যে তিনটি মৌলকে প্রামাণ্য একক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেই প্রামাণ্য একক তিনটির একটি হলো হাইড্রোজেন পরমাণু, দ্বিতীয়টি হলো ক্লোরিন এবং তৃতীয়টি হলো অক্সিজেন পরমাণু। এই তিনটি মৌলের মধ্যে যে কোন একটি মৌলের পরমাণুকে প্রামাণ্য একক হিসাবে ধরেই কোন মৌল বা মূলকের যোজ্যতা আমরা নির্ধারণ করতে পারি। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার আগে এবার যোজ্যতার আসল সংজ্ঞাটি জানিয়ে দিই। কোন মৌলের একটি পরমাণু যে কটি হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন বা অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা ঐ সব মৌল ঘটিত কোন যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন অথবা ক্লোরিন অথবা অক্সিজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে, সে সংখ্যাই মৌলের যোজ্যতা।

এবারে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে আবদ্ধ হ'য়ে একটি জলের অণু (H_2O) গঠন করে। কাজেই এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনকে প্রামাণ্য একক ধরলে অক্সিজেন পরমাণুর যোজ্যতা হয় 2. আবার জিংকের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটার সময় ($Zn+H_2SO_4 = ZnSO_4+H_2$) জিংকের একটি পরমাণু সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) একটি অণু থেকে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে জিংক সালফেট ($ZnSO_4$) ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। কাজেই উপরের সংজ্ঞা অনুসারে জিংকের যোজ্যতা হলো 2. এমনিভাবে ক্লোরিন এবং অক্সিজেনকেও প্রামাণ্য একক ধরে আমরা বিভিন্ন মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করতে পারি। এই প্রসঙ্গে হাইড্রোজেনকে প্রামাণ্য একক হিসাবে ধরে অন্য মৌলের যোজ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন ধর, হাইড্রাজোয়িক অ্যাসিড (N_3H) এবং হাইড্রোজেন সুপার অক্সাইড (HO_2) এর কথা। N_3H যৌগটির সংকেত দেখে নাইট্রোজেনের যোজ্যতা এক এবং হাইড্রোজেন এর যোজ্যতা তিন মনে হবে।—এটা কি ঠিক? মোটেই নয়। এটা ব্যতিক্রমের একটা উদাহরণ মাত্র।

যাই হোক পরমাণুর যোজ্যতা সব সময়েই পূর্ণ সংখ্যা হয়, কখনও ভগ্নাংশ হয় না। তাছাড়া অনেক মৌল আছে, যাদের একাধিক যোজ্যতা হয়ে থাকে। যেমন ধর, সালফারের যোজ্যতা 2, 4 এবং 6 হয়, নাইট্রোজেনের যোজ্যতা তিন হয়, পাঁচও হয়; আবার ধাতব কপারের যোজ্যতা এক হয়, দুইও হয়। মৌলের পরমাণুর কম যোজ্যতা দিয়ে গড়া যৌগকে আস্ (Ous) যৌগ এবং বেশি যোজ্যতা দিয়ে গড়া যৌগকে ইক্ (ic) যৌগ বলে। যেমন ধর, ফেরাস অক্সাইডের আণবিক সংকেত হলো FeO. এক্ষেত্রে আয়রনের যোজ্যতা 2. কিন্তু ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) যৌগে আয়রনের যোজ্যতা তিন। মৌলের পরমাণুর মতো যৌগমূলকদেরও আলাদা আলাদা যোজ্যতা আছে। যেমন ধর হাইড্রক্সিল ($-OH$), অ্যামোনিয়াম ($-NH_4$) ইত্যাদি মূলকগুলির যোজ্যতা এক হয়। ফসফেট (PO_4), কার্বনেট ইত্যাদি মূলকগুলির যোজ্যতা দুই হয়। আবার ত্রি-যোজী মূলক হলো ফেরিসায়ানাইড [$Fe(CN)_6$] এবং চতুর্যোজী মূলক হলো ফেরোসায়ানাইড [$-Fe(CN)_6$]। মৌলদের মধ্যে সবচেয়ে কম যোজ্যতা অর্থাৎ শূন্যযোজী মৌলগুলি হলো হিলিয়াম, নিওন, আরগন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আর সবচেয়ে বেশি যোজ্যতা হলো 'আট'—অসমিয়াম মৌলের। বেঞ্জিন (C_6H_6) এবং ইথিলীন (C_2H_4) দুটি জৈব যৌগ। এদের আণবিক সংকেত দেখে প্রথম ক্ষেত্রে কার্বনের যোজ্যতা 'এক' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'দুই' মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা মোটেই নয়। কার্বনের যোজ্যতা সব সময়েই 4 হয়। এটা ভুলো না যেন।—পরের মাসে যোজ্যতার সাহায্যে কিভাবে যৌগের আণবিক সংকেত শুদ্ধভাবে লেখা যায়—সে আলোচনা করব।

এন. বি. টি—99 এ, নিউট্রাফিক, খড়্গপুর।

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

এক্সপোজার মিটার

ফটোগ্রাফারের কাছে এক্সপোজার মিটার হচ্ছে একেবারে অপরিহার্য জিনিস। এর সাহায্যে তুমি সঠিক আলোর রিডিং পেতে পার। বাজারে এক্সপোজার মিটার কিনতে পাওয়া যায় বটে, তবে তার দাম এত বেশি যে তা অনেকেরই নাগালের বাইরে। এখানে কম খরচে একটা এক্সপোজার মিটার তুমি নিজেই কিভাবে বানিয়ে ফেলতে পার—তা বলা হয়েছে।

এই মজার যন্ত্রটা কাজ করে ফটো ট্রানজিসটরের নীতিতে। ফটো ট্রানজিসটরও সাধারণ ট্রানজিসটর (যেমন 2S B 75 অথবা AC 125) থেকে সামান্য রদবদল করে তুমি বানিয়ে নিতেও পার।

এই ফটো ট্রানজিসটর এমনভাবে উৎপাদন করা হয় যাতে তার অন্তর্নিহিত ফটো ইলেকট্রিক ধর্মকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়।

তোমরা সবাই জান যে একটা ট্রানজিসটরের তিনটে ইলেকট্রোড আছে – কালেকটর, বেস ও এমিটর। যখন আলো এমিটর জাংসনে পড়ে তখন ফটো ইলেকট্রিক কারেন্ট থেকে একটা অভ্যন্তরীণ base কারেন্ট বা input কারেন্ট সৃষ্টি হয়। তাই 2S B 75 অথবা AC 125-এর উপরের ধাতুর envelope খানিকটা সরিয়ে নেওয়া দরকার যাতে করে আলো সরাসরি এমিটর জাংসনে পৌঁছতে পারে।

এই envelope-টা কাটবার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঐ ট্রানজিসটরের ভিতরের অংশে কোনও ক্ষতি না হয়। এর জন্য ট্রানজিসটরকে ভাইসে অথবা সুবিধা মতো অন্য কিছুতে আটকে নিয়ে ধারাল ফাইল দিয়ে ঘষ। এবার কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইড দ্রবণ দিয়ে internal structure wash করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভিতরের সাদা পাউডারের ন্যায় অংশ সম্পূর্ণ সরে না যায়। সাদা পাউডারের মতো অংশটা সম্পূর্ণ সরে গেলে ঐ ট্রানজিসটরকে একটা স্বচ্ছ টেপ-এর মধ্যে আটকে রাখ, এর ফলে ওর ভিতরে জলীয় বাষ্প ঢুকতে পারবে না।

ব্যস, এখন তুমি খুব সহজেই এই ট্রানজিসটরকে ফটো ট্রানজিসটর হিসাবে ব্যবহার করতে পার। এক্সপোজার মিটারের সার্কিট ডায়াগ্রাম ছবি এঁকে বুঝানো হল। আসলে এই সার্কিটে রয়েছে একটা ব্রীজ নেটওয়ার্ক—যার এক বাহুতে পোটেনসিও মিটার ফিক্স করা আছে।

সমস্ত ব্রীজ নেটওয়ার্ক তার দিয়ে একটা বাক্সের মধ্যে

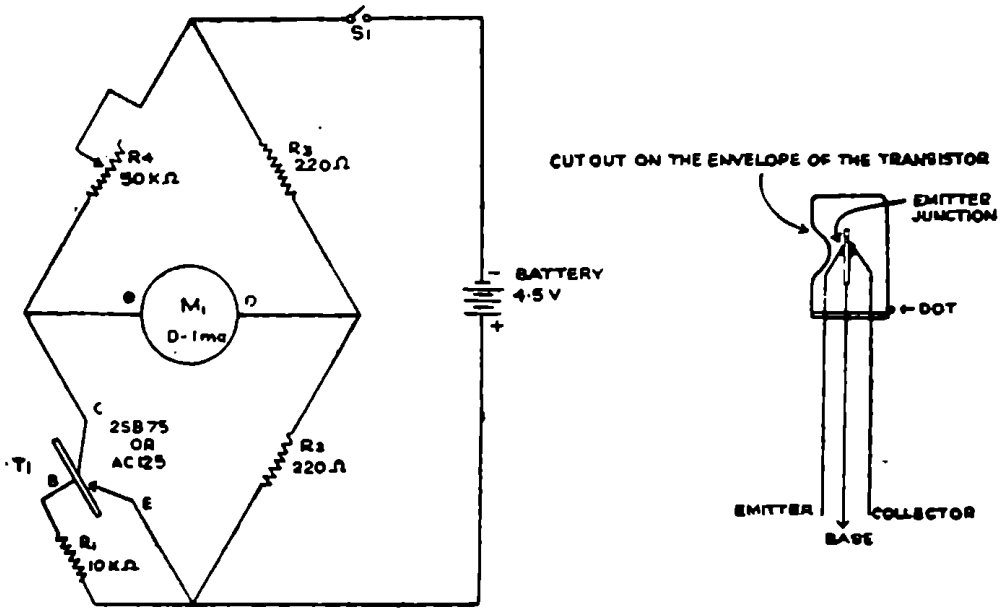

এক্সপোজার মিটারের সার্কিট ডায়াগ্রাম

সংসদ প্রকাশ করেছে

- সেরা অভিধান গ্রন্থমালা
- ধ্রুপদী রচনাবলী
- বিষয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থসমুহ

আর

- আগামী দিনের বড়দের জন্য নানা রঙের ছবি ও মনমাতানো লেখায় ভরা সুন্দর সুন্দর বই

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ফোন ৩৫-৭৬৬৯

কায়দা করে বন্দী করতে পার। বিভিন্ন স্বচ্ছতার গ্লাস-স্লাইডার পোটেনসিও মিটারের এমিটর জাংসনের সামনে রাখা হয় এবং আলোর তীব্রতা অনুসারে মিটার-এর full deflection দেখা যায়। গ্লাস-স্লাইড যত অস্বচ্ছ হবে—আলোর তীব্রতাও তত বেশি দরকার, যার ফলে full scale deflection হতে পারে।

বাক্স বন্ধ করবার পর গ্লাস-স্লাইডকে সম্পূর্ণভাবে হাত দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন আলো ঢুকতে না পারে। এবং পোটেনসিও মিটারকে এ্যাডজাস্ট করে bridge-টাকে ব্যালান্স করবে।

bridge ব্যালান্স করা হয়ে গেলে পোটেনসিও মিটারকে আলোর সংস্পর্শে আনলে ওর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবার ফলে bridge ব্যালান্স-এর ব্যাঘাত ঘটবে। Meter pointer-এর deflection আলোর তীব্রতায় আনুপাতিক হারে বদলে যাবে।

কি কি জিনিস চাই

ট্রানজিসটর : 2SB75 অথবা AC 125; মিলি—এ্যামিটর : 0·1 মিলি এ্যামপিয়ার, মুভিং কয়েল টাইপ; রেজিসটর : 10K ওহম, ½ ওয়াট, 220 ওহম, ½ ওয়াট, (দুটো); পোটেনসিওমিটার : 50K ওহম্ (linear); ব্যাটারী : 4·5 ভোল্ট (তিনটে 1·5 ভোল্ট সিরিজে কানেকশন করেও চলবে); অন্-অফ্ সুইচ, সলডার, নব ইত্যাদি।

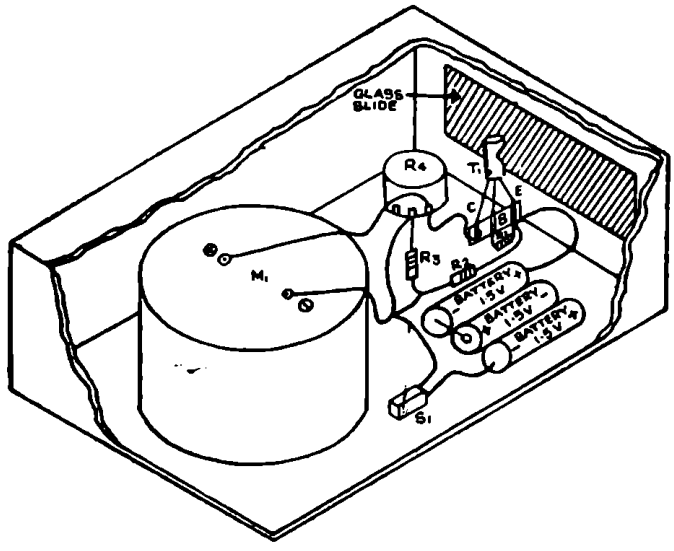

পুরো বাক্সবন্দী প্রোজেক্টের চেহারা

খুদে বিজ্ঞানী মিতালী সংঘ

10 থেকে 15 বছর বয়সের বিজ্ঞানমনস্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্যে সম্প্রতি একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। নাম খুদে বিজ্ঞানী মিতালী সংঘ। ইচ্ছুক কিশোর কিশোরীরা সদস্য হবার জন্য সাদা কাগজে নিজেদের নাম ঠিকানা বয়স ও বিদ্যার্থীর নাম উল্লেখ করে আবেদন করতে পার। সমিতির সদস্যরা বর্তমানে ডাক টিকিট, নানা দেশের মুদ্রা ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। আবেদন করতে হবে : ইন্দ্র কুমার নস্কর খুদে বিজ্ঞানী মিতালী সংঘ। 242 বালিয়া গড়িয়া স্টেশন রোড। কলকাতা 84।

সোদপুর সায়েন্স সোসাইটি

সোদপুর অরুণাচল থেকে রাজা মুখার্জী জানাচ্ছেন যে, সম্প্রতি সোদপুর সায়েন্স সোসাইটী নামে তারা একটি বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বিজ্ঞান মানসিকতা প্রচার ও প্রসারই এই সায়েন্স ক্লাবের লক্ষ্য। সংগঠনের পরবর্তী কর্মসূচী হাতে তৈরি মডেলের প্রদর্শনী।

প্রোগ্রেসিভ সায়েন্স ফোরাম 'অঙ্কুর'

সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াইতে 'অঙ্কুর' নামে একটি নতুন বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। জনমানসে বিজ্ঞান মানসিকতা প্রচারই ক্লাবের অন্যতম লক্ষ্য। ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানুরাগীদের কাছে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রার্থনা করেন।

দ্য সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল

দ্য সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল গত 5—11 জুন পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় মর্যাদার সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে। হাওড়া, মেদিনীপুর, ফলতা, যাদবপুর প্রভৃতি স্থানে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল বর্ণাঢ্য পদযাত্রা, সেমিনার ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। দ্য সায়েন্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের পক্ষে এ সব সংবাদ জানিয়েছেন শুভব্রত রায়চৌধুরী।

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ

অন্যান্য বারের মতো এবারেও মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে একটি কর্মসূচীতে গ্রহণ করে। 5—11 জুন সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীতে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনা চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞান ক্লাবগড়ে তোলা ও বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারে যুব সমাজের ভূমিকা। পরিষদ মডেল প্রদর্শনী ও "ভূপাল আর নয়" শীর্ষক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে এ সব তথ্য জানিয়েছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

নব গঠিত কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সভা বসেছিল গত 5 জুলাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার দপ্তরে। আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ ঘোষ আই আই টিতে (খড়্গপুর) অনুষ্ঠিতব্য পরিষদের সম্ভাব্য কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথিসভ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক জ্ঞানব্রত শীল। গ্রামে গঞ্জে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারে কর্মসূচী গ্রহণের কথা তাঁরা বলেন। সিদ্ধান্ত হয় প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবারে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যরা দপ্তরে মিলিত হবেন।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ মেদিনীপুর জেলার পাঠক পাঠিকা ও বিজ্ঞানুরাগী সুধীবৃন্দের সহায়তায় যে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার অন্যতম কর্মসূচী হল বিজ্ঞান আলোচনা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও স্লাইড প্রদর্শনী। যোগদানেচ্ছু উৎসাহী ছাত্রছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অমরনাথ রায়	সুধাংশু পাত্র
NB/T 99A New Traffic	Po.+Vill—Kalindi
Po. Inda Kharagpur	Dist. Midnapour.
Dist. Midnapour.	

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য
হবার নিয়মাবলী
পরে পত্রিকাতে প্রকাশ করা হবে

চেনা-অচেনা ফুল :

কণ্টক লিলি

প্রায় আড়াই মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কাঁটা সমন্বিত উদ্ভিদে মে-জুলাই মাসে লম্বা ফানেলের আকৃতিবিশিষ্ট হাল্কা হলুদ রঙের ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। অসংখ্য ফুল ঘণ্টার মত ঝুলতে থাকে। দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। কিন্তু যেই ফুল তুলতে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা ফুটে রক্তপাত। গাছে এত কাঁটা তাই এর নাম কণ্টকলিলি। ইংরাজীতে প্রিকলি অ্যাপেল, স্প্যানিশ গোয়াভা, লিলি থর্ন বলে। বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাটেসবিয়া স্পাইনোসা। লিনিয়স প্রথম এই গাছটির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করেন এবং গণের নামকরণ করেন ক্যাটেনস্‌বিয়া —ইংরাজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মার্ক ক্যাটেস্‌বাইয়ের (1679-1749) সম্মানার্থে, যিনি পরিব্রাজক ও প্রকৃতি সন্ধানী ছিলেন। এই উদ্ভিদটি কণ্টকময় সেজন্য প্রজাতির নাম স্পাইনোসা হয়, ল্যাটিন ভাষায় স্পাইনোসা কথার অর্থ কাঁটাবহুল। এই উদ্ভিদটি রুবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এই উদ্ভিদটির আদিনিবাস ওয়েস্ট ইনডিজ। এখন সারা ভারতে হয়।

চিরসবুজ কাঁটাবহুল গুল্ম বিশেষ। উচ্চতা প্রায় 1—2·5 মিটার হয়। কাঁটাগুলি প্রতিটি অভিমুখ বিন্যাস যুক্ত তীক্ষ্ণ এবং ঊর্ধ্বমুখী হয়। পাতাগুলি খুব ছোট, পুরু, ডিম্বাকৃতি অভিমুখ পত্রবিন্যাস, মসৃণ ও গাঢ় সবুজ রঙের হয়। খুব ছোট পত্রবৃন্ত থাকে। প্রতিটি কক্ষে একটি করে চারটি পাঁপড়িযুক্ত 8—10 সে.মি. লম্বা হাল্কা হলুদ রঙের ফানেল আকৃতির ফুল হয়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর অবধি ফুল হয়। তবে মে থেকে জুলাইয়ের ফুলের প্রাচুর্যতা থাকে। আবার কখনও কখনও শীতকালেও ফুল হতে দেখা যায়। পুংস্তবক চারটি হয়। প্রতিটি পুংদণ্ড দুইটি পাঁপড়ির মধ্যবর্তী দলনল থেকে উদ্ভূত হয়। একে ইংরাজীতে এপিপেটালাস স্ট্যামেন বলে। গর্ভদণ্ড একটি, গর্ভমুণ্ড দ্বিবিভক্ত হয়।

ফল আকৃতিতে ছোট হয়। তবে ফল সাধারণতঃ আমাদের দেশের জলবায়ুতে কদাচিৎ হয়।

এই প্রজাতিটির বংশ বর্ষাকালে কাটিং দ্বারা হয়।

এই ফুলগাছটি অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, রবীন্দ্র সরোবর, বিভিন্ন পার্ক ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায়।

(ফটো : সুবল কৃষ্ণ দে)

এণাক্ষী বিশ্বাস

আবিষ্কারের গল্প

থার্মোমিটার

জিজা বেচারার জ্বর হয়েছিল। বিকেল থেকে জ্বর ছেড়েছে। তাই আস্তে আস্তে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গলায় আগের জোর নেই, প্রায় ফিসফিস করে বলল 'কাকু গল্প বলো'। আমি দেখলুম বেগতিক, জ্বরের কাঁধিন ধরে গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আমার স্টক প্রায় শেষ। এমন সময় জিজার মা এলেন। হাতে থার্মোমিটার। বললেন 'জিজা, এসো', চট করে একবার থার্মোমিটারটা 'লাগিয়ে ফেল'। আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম 'জিজা, থার্মোমিটারের গল্প শুনবে'। জিজা বলল 'হ্যাঁ'। আমি অমনি মনে মনে গল্প ভাঁজতে রইলুম।

থার্মোমিটার কি করে কাজ করে তা প্রথম আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। সেটা অবশ্য অন্য ধরনের থার্মোমিটার, আমরা এখন যেরকমটি ব্যবহার করি সেরকম নয়। সেটাকে বায়ু থার্মোমিটার বলত। আসল কথা কি জানো, কোন একটা জিনিস গরম হলে বাড়ে। ঠান্ডা হলে ছোট হয়। এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে সেন্টিগ্রেড ফারেনহাইট পারার থার্মোমিটার আবিষ্কার করলেন। একটা সরু কাঁচের নলের মুখে একটা ফোলানো জায়গা। সেখানে কিছুটা পারা ভরে দেওয়া হল। জ্বরের সময় শরীরের উত্তাপের সংস্পর্শে এসে সেই পারাটা বেড়ে যেত। আর ওই সরু নল বেয়ে উঠতে থাকত। তখন নলের গায়ের উত্তাপের মাপ লিখে দেওয়া হত। তাকে আমরা বলি ফারেনহাইট ডিগ্রী। পারা যখন আর ওপরে ওঠে না, তখন সেই মাপটাই আমাদের শরীরের উত্তাপের মাপ। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরের উত্তাপ 98°6 ডিগ্রী।

জিজার মুখ থেকে থার্মোমিটার বার করলেন বৌদি। লেখা পড়ে বললেন, জ্বর নেই, আটানব্বই। এবার তো গল্পটা বলতেই হয়।

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

আই-কিউ-টেস্ট/আগস্ট '86

1. ভারতবর্ষে কুচিপুরি নৃত্যের বিষয়বস্তু কোনটির ওপর ভিত্তিকরে গড়ে উঠেছে ঃ
(a) শকুন্তলা (b) রামায়ণ (c) মহাভারত (d) রামায়ণ এবং মহাভারত (e) এদের কোনটিই নয়।

2. ঊর্ধ্বক্রমানুসারে সাজাও ঃ
(a) দেশ (b) গ্রাম (c) জেলা (d) পথ (e) শহর।

3 অত্যধিক পরিশ্রমে অক্সিজেন স্বল্পতার যে শ্বসন চলে তাতে উৎপন্ন হয় ঃ
(a) সাইট্রিক অ্যাসিড (b) পাইরুভিক অ্যাসিড (c) ল্যাকটিক অ্যাসিড (d) এদের কোনটিই নয়।

4. গভীর সমুদ্রে ডুবুরীরা শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের সঙ্গে নিচের কোনটি ব্যবহার করেন ঃ
(a) হাইড্রোজেন (b) জেনন (c) নিয়ন (d) এদের কোনটিই নয়।

5. কোন বিদ্যালয়ে 600 জন ছেলের মধ্যে 400 জন ফুটবল খেলে এবং 250 জন ক্রিকেট খেলে। ফুটবল এবং ক্রিকেট দুটি খেলাই খেলে এমন ছাত্রসংখ্যা।
(a) 40 জন (b) 50 জন (c) 30 জন (d) 250 জন।

জুন '86তে প্রকাশিত আই-কিউ টেস্টের সমাধান

1. e) বিন্দু (b. রেখা (c) কোণ (d) ত্রিভুজ (d) আয়তক্ষেত্র।

2. 3-1513 (a) বুলন্দ দরোয়াজা (b) কুতুব মিনার (c) সেণ্ট হেলেনা (d) ইয়র বেঙ্গল (e) বাবুল চেম্বার (f) নিয়ন গ্যাস (g) ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (h) জুডো।

4. (c) 14569 / 5. আসাম

ভূগর্ভের সম্পদ ঃ

জিবসাইট

বর্তমান শতাব্দীতে শিল্পের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই ধাতুরই এক উল্লেখযোগ্য আকরিক হলো জিবসাইট। জিবসাইট-এর রাসায়নিক সংযুতি $Al_2O_3, 3H_2O$, যার মধ্যে অ্যালুমিনা (Al_2O_3) শতকরা 65·4 ভাগ এবং জল শতকরা 34·6 ভাগ। এই মণিকটির কেলাস মনোক্লিনিক গোষ্ঠীভুক্ত এবং আয়তঘনকাকার হবার প্রবণতা বেশি। তবে এর কেলাস গোলকাকার পিণ্ডের মতো অথবা অনেকটা দণ্ডাকৃতিও হতে পারে। জিবসাইটের স্ফটিকের দুর্বলতাতল স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে এবং তার সমান্তরালে একে সহজেই ভেঙ্গে ফেলা যায়। দুর্বলতা তলে মণিকটির দ্যুতি মুক্তোর মতো এবং অন্যান্য তলে কাচের মতো। মোজ স্কেলে এর কাঠিন্য 2·5 থেকে 3·5-এর মধ্যে।

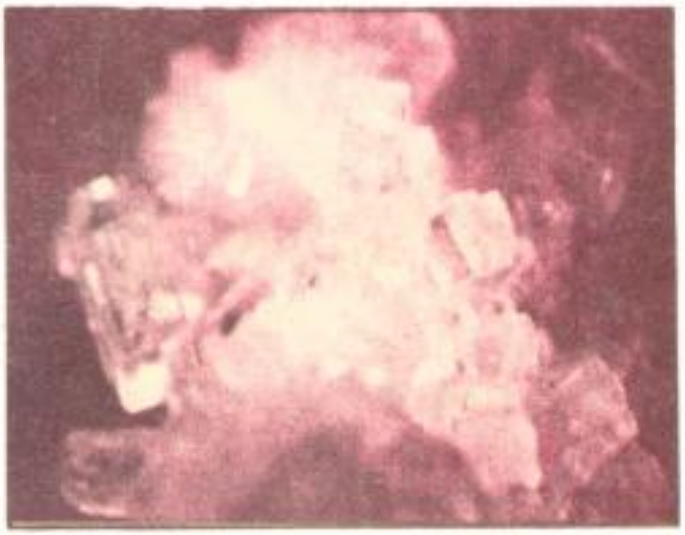

জিবসাইটের রঙ ধূসর, সাদা সবুজাভ কখনও বা লালচে সাদা হয়। তবে রঙ যেমনই হোক না কেন, মণিকটি স্বচ্ছ। সাধারণত বক্সাইট-এর সাথে মিলিত অবস্থায় জিবসাইটকে পাওয়া যায়। আবার বক্সাইট-এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভাঁড়ারে এবং ল্যাটেরাইট জাতীয় মাটিতেও জিবসাইট মেলে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে 'জিবসাইট' ল্যাটেরাইট ও বক্সাইটের ভাঁড়ারে উৎপন্ন হয় উপজাত মণিক হিসাবে, পূর্বতন অ্যালুমিনিয়াম বহনকারী মণিকের পরিবর্তন সাধিত হয়ে। জিবসাইট-এর উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিস্থান হলো ক্যালিফোর্নিয়া অ্যারিজোনা, আরকানসাস্, পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক, ব্রাজিল, জার্মানী, নরওয়ে, ইটালী, ফ্রান্স ও আমাদের ভারতবর্ষ। ছোট্ট করে বলে রাখি, এই মণিকটির নামকরণ হয়েছিল কর্নেল 'জর্জ' জিবস'-এর নামানুসারে।

অমরনাথ রায়

জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট

মান : VI—VIII August 1986

1. বাদুড়ের লেজ আছে কি ?
2. 'ভাজক কলা' সাধারণত উদ্ভিদের কোন্ অংশে থাকে ?
3. 'হায়রোগ্লিফ' লিপি উদ্ভাবন করেছিলেন কারা ?
4. 'মুচ্ছকটিক' কে রচনা করেছিলেন ?
5. আরবীয় চিকিৎসা পদ্ধতির নাম কি ?
6. কোন্ বিজ্ঞানী তড়িৎ ও চুম্বকের সম্পর্ক গণিতের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ?
7. গন্ধক দ্রবীভূত হয় কোন্ তরলে ?
8. আখের চিনিতে কোন্ কোন্ উপাদান মৌল আছে ?
9. প্রথম মহাকাশচারীর নাম কি ?
10. ভারতবর্ষ কোন্ ভৌগোলিক গোলার্ধে অবস্থিত ?
11. দাবার বোর্ডে কতগুলি বর্গক্ষেত্র আঁকা থাকে ?

June 1986-এ প্রকাশিত

জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট এর সমাধান।

1. কুড়িটি। 2. না, হয় না। 3. জেন্দ আবেস্তা। 4. হোমারকে। 5. খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ 'বরাহমিহির'। 6. চন্দ্রগর্ভ।
7. / বিকিরণ পদ্ধতিতে।
8. ভুটানের।
9. জাপানের।
10. ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

জুন '৪৬-এর ফাস্ট ক্যুইজের সমাধান

জর্জ স্টিফেনসন কর্তৃক আবিষ্কৃত স্টীম ইঞ্জিন 'রকেট'।

'উইণ্ডমিল' বা বায়ুচালিত কল।

ফোটো ক্যুইজ

এই গাছটির নাম কি বলতে পার ?

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

জুন '86-এর আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেটের জন্য নির্বাচিত হয়েছে :

1. রুনু নিয়োগী
প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী
গ্রাম-পানপুর, ডাক-নারায়ণপুর
ভায়া-কাঁকিনাড়া, উত্তর 24 পরগণা-743126
2. গৌতম মজুমদার
প্রযত্নে, পি. কে. মজুমদার
ইউনিভার্সিটি কে য়ার্টার্স
অভয় কানন, বোর হাট
ডাক-নূতনগঞ্জ, বর্ধমান-713104
3. কৌশিক কুমার দাস
প্রযত্নে, কল্যাণ কুমার দাস
ওল্ড নিমতা রোড, কালচার শেড,
ডাক-নিমতা, কলকাতা-700049
4. মিঠু ঘোষ
প্রযত্নে, সুশীল কৃষ্ণ ঘোষ
গ্রাম-তেলাড়ী, ডাক-বাহিরকুঞ্জ, 24-পরগণা
5. স্নেহাশীষ চন্দ্র
প্রযত্নে, বিনয়কৃষ্ণ চন্দ্র
'গীতগীতা ভবন',
বোরহাট কালীতলা,
ডাক-নূতনগঞ্জ, বর্ধমান-713104
6. তপন কুমার মণ্ডল
প্রযত্নে, হরশিৎ হীরা,
গ্রাম-লেলিনগড় 'A' ব্লক
ডাক-চাঁদপুর, লেনিন গড়, উত্তর 24-পরগণা
7. চন্দ্রাণী রায়
প্রযত্নে, জে. এন. রায়
নর্থ ভবানীপুর,
ডাক-খড়্গপুর 721301, মেদিনীপুর।
8. শ্রীদাম সরকার
প্রযত্নে, বৈকুণ্ঠ সরকার
গ্রাম-মিলন নগর, ডাক-বগুলা, 741502, নদীয়া

জুন '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে :

1. সব্যসাচী ভট্টাচার্য
প্রযত্নে, সমীর নাথ ভট্টাচার্য
হরিনাভি, 19/1, আর. এন. টি রোড
ডাক-হরিনাভি, 24-পরগণা।
2. অনুপম দাশ মাজী
প্রযত্নে, সরোজ কুমার মাজী
গ্রাম + ডাক-রানিয়া গোবিন্দপুর
বিড়লাপুর, 24-পরগণা।
3. অনুপম বসুরায়
কাঁটাপুকুর,
ডাক-মগরা, হুগলী।

জুন '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : কৌশিক বাগচী,
হাওড়া : সুদীপ্ত সাহা, বরুণ বিশ্বাস,
বর্ধমান : দেবজ্যোতি পানি,
মেদিনীপুর : চৈতালী কুণ্ডু,
নদীয়া : শিপ্রা পাল,
বাঁকুড়া : সুব্রত কুমার পাত্র,

আই-কিউ-টেস্ট জুন 86'-এর সমাধান

1. (c) বিন্দু, (b) রেখা, (c) কোণ, (a) ত্রিভুজ (d) আয়তক্ষেত্র।
2. 3-15
3. (a) বুলন্দ দরওয়াজা, (b) কৃত্রিম সিল্ক, (c) সেণ্ট হেলেনা, (d) ইয়ং বেঙ্গল, (e) বাবুল চেম্বার, (f) নিয়ন গ্যাস, (g) ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, (h) জুডো।
4. (c) 1, 4, 5, 6, 9
5. আসাম।

জুন '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের সব কটির সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে :

1. দীপ্তিরাণী সামন্ত
প্রযত্নে, হরেকৃষ্ণ সামন্ত
1/99 বিজয়গড়, যাদবপুর
কলকাতা—70(032
2. রুনু নিয়োগী
প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী
গ্রাম-পানপুর, ডাক-নারায়ণপুর
ভায়া-কাঁকিনাড়া, 24-পরগণা-743126

জুন ' 6-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠীক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে :

1. অরিন্দম দাশমাজী
প্রযত্নে, সরোজ কুমার মাজী
গ্রাম ও ডাক-রানিয়া গোবিন্দপুর,
ভায়া-বিড়লাপুর, 24-পরগণা।
2. রাজশ্রী সেনগুপ্ত
রিজেন্ট পার্ক হাউসিং এস্টেট
ব্লক-12, ফ্ল্যাট 2
কলকাতা-700040

বি. দ্র : জুন '86 সংখ্যার আই-কিউ-টেস্ট এর 4নং প্রশ্নের পূর্ণ সংখ্যার স্থলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পড়তে হবে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

জুন '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. বাপী দাস
প্রযত্নে, মাকসাম এন্টার প্রাইজ
92, নকরি মণ্ডল রোড
কাঁচড়াপাড়া, উত্তর 24-পরগণা।
2. শীর্ষেন্দু গুহ মজুমদার
প্রযত্নে বিমলেন্দু গুহ মজুমদার
আনন্দ নগর, দক্ষিণ বেহালা রোড
কলকাতা-7000061
3. পার্থ দাস
18B. নলিন সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-700004

জুন '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্টের দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতাদের নাম :

কলকাতা : কণাদ মুখার্জী, অংশুমান মুখার্জী, বরুণ চৌধুরী. মহুয়া ঘোষ অনির্বাণ সান্যাল, প্রতীপ ভট্টাচার্য, জয়দীপ ঘোষ, অনির্বাণ দত্ত, পিয়াল ঘোষ, শুভদীপ চক্রবর্তী।

উত্তর 24-পরগনা : শ্রীকুমার দে, রাণা ভট্টাচার্য, শঙ্খনাথ ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ সেনশর্মা, অঞ্জন সেনগুপ্ত, সরস্বতী সেন।

হুগলী : সব্যসাচী দত্ত।

বর্ধমান : দিব্যেশ চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ দেবনাথ, পঙ্কজ রায়, প্রবাল মিত্র শুভাশিস পাইন।

মেদিনীপুর : সুভাষ দে।

নদীয়া : রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

পশ্চিম দিনাজপুর : দুর্জয়শেখর রায়, আদিত্য বাগচী, অনন্যা বাগচী।

হাইগ্রোমিটার

(61 পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নির্দেশকটা কার্ডবোর্ডের যে জায়গায় স্থান নির্দেশ করছে, সেখানে 100 দাগ দাও। অর্থাৎ এই অবস্থায় যন্ত্রটা শতকরা 100 ভাগ জলীয় বাষ্পপূর্ণ জায়গায় রাখা হয়েছে। এছাড়া কার্ডবোর্ডে আরও দুটি জায়গায় দাগ দিতে হবে। সেজন্য তোমরা কোনও বিজ্ঞানাগারে গিয়ে ভাল হাইগ্রোমিটারের সঙ্গে তুলনা করে দুটি দাগ দেবার ব্যবস্থা করবে। এখন এই তিনটি নির্দেশক দাগ দেওয়া হলেই বাকি অংশটুকু 5 ঘর অন্তর দাগ দিয়ে 5 থেকে 100 পর্যন্ত দাগ কাটলেই কাজ চলবে।

ব্যস্ হাইগ্রোমিটার তৈরি শেষ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণের হেরফের অনুযায়ী চুলের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। তার ফলে কাটিমটিও ঘুরবে এবং সেই সঙ্গে নির্দেশকটিও কার্ডবোর্ডের ওপর বিভিন্ন জায়গা নির্দেশ করবে।

210/A, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-700 050

হাইগ্রোমিটার

সিদ্ধার্থ সরকার

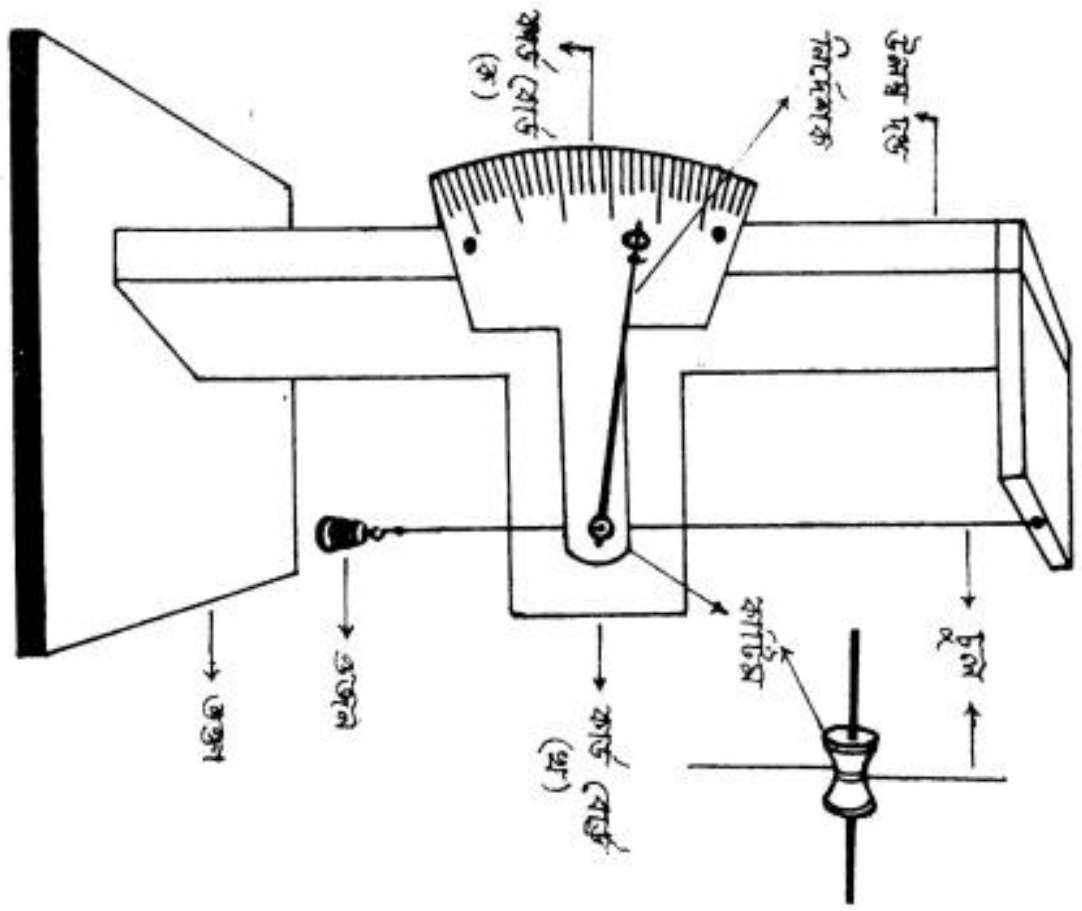

আমরা জানি আমাদের চারদিকে বাতাসে সবসময়ে কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। অবশ্য সময় বিশেষে কমবেশি হয়ে থাকে। এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তাকে হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) বলে। আজ একটা অতি সহজে বানানো যায় এইরকম হাইগ্রোমিটার বানানোর কৌশল বলব। এই হাইগ্রোমিটার একদম সঠিক পরিমাপ না দিলেও মোটামুটি একটা ধারণা এর থেকে পাওয়া যাবে।

যে হাইগ্রোমিটারটি তোমাদের আজ বলব, তার নাম Hair Hygrometer বা চুলের তৈরি হাইগ্রোমিটার। এবার তাহলে যা যা জিনিস লাগবে তার ফর্দটা দেওয়া যাক্।

1. লম্বা একগাছা মেয়েদের চুল (30 সেমি. মত)।
2. এক টুকরো ইট (যার ওজন 50 গ্রামের মত)।
3. একটি ছোট খালি সুতোর কাটিম।
4. কিছু কার্ডবোর্ড, একটা উল্লম্ব দণ্ড, একটা ছোট কাঠের টুকরো, এক টুকরো সরু রড (4 সেমি. মত)।

প্রথমে ঐ চুলটাকে ভালভাবে সোডার জলে ধুয়ে ওর গা থেকে চকচকে মসৃণ ভাবটা তুলে ফেল। এবার চুলের একপ্রান্ত উল্লম্ব দণ্ডের মাথার দিকে আটকে দাও। কার্ড বোর্ডের টুকরোটিকে ছবিতে দেখানো কার্ডবোর্ড (ক) আকৃতির মত কেটে উল্লম্বদণ্ডের একপাশে পেরেক দিয়ে আটকে দাও। দণ্ডের অপর দিকে কার্ডবোর্ড (খ) আটকে দাও। এবার ঐ কার্ডবোর্ড দুটির প্রান্তে সমানভাবে দুটি ফুটো করে তার মধ্যে সরু রডটি গলিয়ে দাও। রডটা ঐভাবে আটবার আগে কাটিমটা রডের মধ্যে গলিয়ে দেবে। ছবি অনুযায়ী কাটিমটা কার্ডবোর্ড দুটোর মধ্যে থাকবে। তারপর চুলের অপর প্রান্তটা কাটিমের গায়ে দুতিনবার পাক খাইয়ে ঐ ইটের সাহায্যে ঝুলিয়ে দাও। এবার একটা মোটা কার্ডবোর্ড থেকে খানিকটা অংশ কেটে একটা নির্দেশক (Pointer) তৈরি করে সরু রডের গায়ে এমনভাবে আটকে দাও, যাতে নির্দেশকটি বড় কার্ডবোর্ডটির (ক) গায়ে লেগে থাকে।

এবার একটি পাত্রে গরম জল রেখে সেই পাত্রের ওপরে ঐ হাইগ্রোমিটারকে এমনভাবে রাখ যাতে চুলের অংশটি ঠিক জলের ওপর থাকে। এবার ওপর থেকে একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে সবশুদ্ধ ঢেকে দাও। এই অবস্থায়

(শেষাংশ 60 পৃষ্ঠায়)

কারবাইট গ্যাস স্টোভ

রাজেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

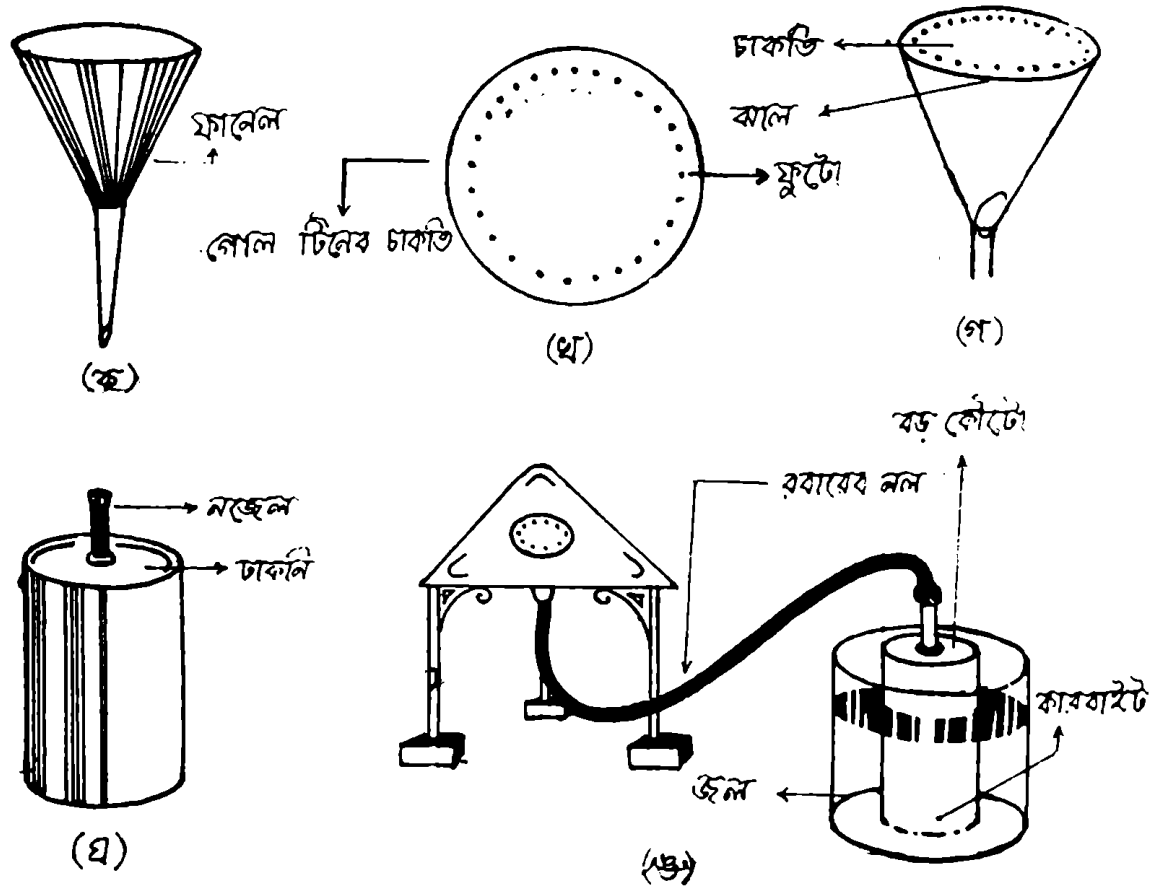

তোমরা অনেকেই গ্যাস স্টোভের কথা শুনেছ। কিন্তু এখানে যে স্টোভের কথা লিখছি সেটা করা খুবই সোজা। এবং অন্যান্যদের মতো বিপজ্জনকও নয়।

প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগাড় করে ফেল।

(i) একটা টিনের ফানেল।

(ii) একটা বড় ও একটা ছোট আমুলের কৌটো।

(iii) সাইকেলের টিউবের নজেল একটা।

(iv) দু হাত লম্বা রবারের নল।

প্রথমে বড় আমুলের কৌটোর ঢাকনিটা ফানেলের উপরের অংশের মতো গোল করে কেটে নাও। এবার ঐ গোল চাকতিটার কিনারা বরাবর গোল করে অ লপিন দিয়ে ফুটো করে নাও। ফুটো করার পর ঐ চাকতিটা ফানেলের উপরে ঝাল দিয়ে আটকে দাও। ভালভাবে ঝাল দেবে কোন ফাঁক যেন না থাকে। এবার ছোট আমুলের কৌটোর ঢাকনিটার মাঝখানে নজেলের মাপে ফুটো করে নজেলটা ভাল করে আটকে দাও। ফানেলটা তিন পাওয়ালা একটা যে কোন স্ট্যাণ্ডের মাঝখানে আটকে দাও। ফানেলের নিচের সরু অংশে রবারের নলের একপ্রান্ত আটকে দাও অন্য প্রান্তটা নজেলের সঙ্গে আটকে দাও। এখন কিছুটা (25 গ্রাম কারবাইট ঐ ছোট আমুলের কৌটোর মধ্যে রেখে ঢাকনিটা ভাল করে আটকে দাও। ঐ কৌটোটাকে এবার বড় আমুলের কৌটোর মধ্যে রাখ। এখন বড় কৌটোর মধ্যে বেশ কিছুটা জল ঢাল। কিছুক্ষণ পর এই ফানেলের ওপরের ফুটোগুলোয় দেশলাই জেলে দিলে দেখবে তোমার তৈরি স্টোভ কি সুন্দর জ্বলছে। ব্যাস, চটপট জিনিসগুলো জোগাড় করে তৈরি করতে শুরু করে দাও।

বিঃ দ্রঃ—কারবাইট লোহার দোকানে পাওয়া যাবে।

রাজেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, বিজ্ঞানক্লাব কাটোয়া।

সম্পাদক—'অনুসন্ধানী'

প্রশ্নোত্তর

বেথুয়াডহরী—নদীয়া থেকে রণজিৎ সরকারের চিঠির উত্তরে জানাই যে, গত মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবন্ত জীবাশ্ম' প্রসঙ্গে প্রশ্নটির উত্তর অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাপা হয়েছে। পরের অংশটুকু ভুলক্রমে বাদ পড়ার জন্য দুঃখিত। এবং আপনি উত্তরও ঠিক দিয়েছেন। হংস চঞ্চুই তেমন জীবন্ত জীবাশ্ম—যারা ডিম পাড়ে অথচ ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরুলে বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে।

প্রঃ—(1) ভূত, আত্মা, জন্মান্তর, প্ল্যানচেট ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানতে চেয়েছো অনেকে। (1) আকনা, হুগলী থেকে সুপ্রিয় আদক; (2) ইনাথনগর, বর্ধমান থেকে দীপঙ্কর পাল; (3) নিউ কলোনী, কাঁচড়াপাড়া 24-পরগনা থেকে চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী; (4) দক্ষিণ রাধানগর শ্রীগৌরাঙ্গ হাইস্কুল থেকে সওকত হোসেন মোল্লা; (5) মছলন্দপুর—24-পরগনা থেকে সৌম্যেন মিত্র এবং (6) পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর থেকে প্রবাল দাস।

উঃ প্রথমে তোমাদের জানাই যে, বিজ্ঞানের কাছে এইসব প্রশ্নের জবাব মিলবে না। অর্থাৎ ভূত, আত্মা, জন্মান্তর ইত্যাদি কোন কিছুই বিশ্বাস করে না বিজ্ঞান। এগুলি এক একটি সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়।

আজকের আমাদের সমাজের অধিকাংশেরই ধারণা, মানুষের অতৃপ্ত আত্মা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখনও কারও ঘাড়ে ভর করে, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মৃত্যু সম্বন্ধে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে ভূত, আত্মা ইত্যাদির কোন প্রশ্নই আসে না। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক চরক ও শুশ্রুত সাধারণে যাকে ভূতে পাওয়া বলে তাকে বলে গেছেন বায়ুরোগ এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতিও উল্লেখ করেছেন। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌পিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় না। হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছেন শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি কৃত্রিমভাবে হৃদ্‌স্পন্দন চালু করা যায় এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্জীবন লাভ করে। এখন প্রশ্ন, এই অবস্থায় আত্মা কি পুনরায় এসে ঢুকে পড়ে শরীরের মধ্যে?

তোমরা নিশ্চয় জান, মানবদেহ কতকগুলো যন্ত্রের সমন্বয় ছাড়া কিছু নয়। সাময়িকভাবে ওদের কারও কারও গোলমাল হলে ওষুধ দিয়ে অথবা প্রয়োজনে যন্ত্রাংশের পরিবর্তন, সংযোজন বা সংশোধন করে তাদের আবার চালু করা যায়। অপরদিকে আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র শরীরের সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হলেই ওদের মৃত্যু ঘটে না। খাদ্য ও অক্সিজেনের অভাবে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং সাত আট মিনিট পরে কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভাষায় প্রথম অবস্থাকে বলে ফিজিক্যাল ডেথ এবং পরের অবস্থাকে বলে কেমিক্যাল ডেথ। কেমিক্যাল ডেথ ও ফিজিক্যাল ডেথের মধ্যবর্তী অবস্থায় যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অনেক সময় রোগী বেঁচে উঠতে পারে কিন্তু কেমিক্যাল ডেথের পরে আর কিছু করার থাকে না। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান আবার এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সে মানুষকে হয়ত অমরত্ব দান করতে পারবে না কিন্তু শতবর্ষের অধিক পরমায়ু দান করতে অবশ্যই সক্ষম হবে। তাহলে নিয়তি, ভূত প্রভৃতি সংস্কারগুলোকে কেমন করে মেনে নেওয়া যাবে, তোমরাই বিচার কর!

যারা জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছ, তারাও আজকের উন্নত বিজ্ঞানের কথা একবার চিন্তা করে দেখ। তোমরা নিশ্চয়ই জান, আজকের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি জীব যখন প্রথম মাতৃগর্ভে যাত্রা শুরু করে সেখান পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। জননীজঠরে আদিম সেই একক কোষটির জন্য পিতামাতা উভয়েরই আছে সমান ভূমিকা। আদি কোষটি গঠিত হয় পিতার শুক্রাণু থেকে পাওয়া 23-টি এবং মাতার ডিম্বাণু থেকে পাওয়া 23টি—মোট 46টি ক্রোমোজোম দিয়ে। মাতার ডিম্বাণুর আবার সূচনা হয়—তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন সেই সময়ে। অপরদিকে ক্রোমোজোমগুলি পিতা ও মাতার উভয়েরই বংশানুক্রমিক। অতএব বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ক্রোমোজোমগুলির দ্বারা গঠিত আদি কোষ যখন বিভাজনের দ্বারা একটি মানবে পরিণত হয় তখন আত্মার পুনর্জন্মকে কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? আর আত্মাই বা কী! মানব শরীরে তো অসংখ্য কোষ! সে একক কিছু নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্য অসংখ্য কোষের মৃত্যু হচ্ছে এবং বিভাজনের ফলে নতুনের জন্ম দিচ্ছে। শুধু কেমিক্যাল ডেথ হলে আত্মার কথা উঠবে কেন?

প্রেত, আত্মা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে আমাদের মনে এক বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। কাল্পনিক ভূতের ভয়ে ভীত না হয়ে কিংবা প্ল্যানচেটের মত অবৈজ্ঞানিক আচরণকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাচাই করে দেখ। এক সময় বুঝতে পারবে, এগুলো সবই ধোঁয়া। বাস্তবে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তোমরাও এখন থেকে এ সবের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা কর।

প্রঃ শুনেছি, এক ধরনের গাছ নাকি মানুষ খায়! এরা কোথায় জন্মায় এবং নাম কি! (1) সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, রামপুরহাট—বীরভূম ও (2) বিমল কুমার মাহাতো, গোলামারা—পুরুলিয়া।

উঃ পতঙ্গভুক উদ্ভিদ কলসবৃক্ষ, সূর্যশিশির বা ড্রসেরা, পাতা ঝাঁঝি ইত্যাদি কারও অজানা নয় তবে বড় বড় জন্তুজানোয়ারকে আটকায় এমন উদ্ভিদের পরিচয় খুব একটা পাওয়া যায় না। শোনা যায়, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে এক ধরনের মোটা লতা বড় বড় গাছকে অবলম্বন করে ঝুলতে থাকে।

নাগালের মধ্যে মানুষ কিংবা জন্তুজানোয়ারকে পেলে একরকম চুম্বকের মত তারা আকর্ষণ করে নেয় এবং ডগাগুলো জড়িয়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। তারপর জড়িয়ে ধরা জীবটি মারা গেলে লতার বাঁধন খুলে যায়। এই লতাটির নাম সিসিয়া।

প্রঃ অনেক সময় সন্ধ্যায় একটি, কখনও কখনও দু-তিনটি ছোট ছোট তারাকে আকাশ পরিক্রমা করতে দেখা যায়। এগুলো কি? শচীন রায়চৌধুরী, খোদাশিসন—ফলতা, 24-পরগনা।

এরা মনুষ্য প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ। পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক খবর সংগ্রহ, টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা কাজে সুবিধা লাভের জন্য মানুষ এদের পৃথিবীকক্ষে স্থাপন করেছে। আর এরা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পরিক্রমা করে চলেছে। দিনের বেলায় প্রখর সূর্যালোকে ওদের দেখা যায় না। সন্ধ্যার পরে সূর্যের আলোকে আলোকিত অবস্থায় সচল তারা রূপে ধরা পড়ে আমাদের চোখে।

প্রঃ (1) আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? দেবব্রত জানা ও সজল দত্ত—তুতরাঙ্গা হাই স্কুল, ঠাকুরচক, মেদিনীপুর। (2) সূর্য শক্তির উৎস কি? অশোক মান্না, মহেন্দ্রগঞ্জ সাগরদ্বীপ, (3) আকাশের রঙ নীল কেন? তপন কুমার রায়, হলদিবাড়ী হাইস্কুল, কোচবিহার।

তোমরা সবাই লিখেছ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোমরা নিয়মিত পাঠক। অতএব তোমাদের উত্তরের জন্য পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেখ।

প্রঃ নৌকম্পাসের আবিষ্কর্তা কে? দীপেন্দ্র ঘোষ, নন্দীগ্রাম মেদিনীপুর।

উঃ নৌকম্পাস মধ্যযুগে চীনারাই নাকি আবিষ্কার করেছিলেন। ওঁদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন ইওরোপীয় নাবিকরা। আবিষ্কর্তার প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না।

প্রঃ কোয়াসার কি? (1) শান্তনু দাস—সুদর্শনপুর রায়গঞ্জ পঃ দিনাজপুর ও (2) শৈবাল গাঙ্গুলী, ফালাকাটা-জলপাইগুড়ি।

উঃ বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এমন কতক-গুলো আশ্চর্যজনক জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের দেখতে অনেকটা সাধারণ নক্ষত্রের মত হলেও অতিশয় দীপ্তিমান এবং এদের দেহ থেকে যে পরিমাণ আলোক রশ্মি ও বেতার রশ্মি বিকিরিত হয় তা এক একটি গ্যালাক্সী থেকে বিকিরিত রশ্মির প্রায় সমান। এদের আলোক রশ্মি এবং বেতার রশ্মি উভয়ই স্পন্দনশীল কিন্তু সেফাইড বা স্পন্দন-তারা নয়। অপরপক্ষে ওদের বর্ণালীর সঙ্গে সাধারণ কোন নক্ষত্র, নবতারা বা নোভা, সুপার নোভা, এমন কি নীহারিকার বর্ণালীরও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওরা সব সময় অতি শক্তিশালী বেতারতরঙ্গ এবং অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করতেই আছে। এই প্রচণ্ড তেজ বিকিরণকারী জ্যোতিষ্কদের বলা হয় Quasi Stellar Radio Sources বা সংক্ষেপে Quasar তথা কোয়াসার।

কোয়াসাররা কত দূরে অবস্থান করছে সে-বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একমত নন। তবে ওদের বর্ণালীতে লাল অপসারণের মাত্রা হিসেব করে অনেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে প্রান্ত সীমায় এরা অবস্থিত। এ পর্যন্ত একশটিরও বেশি কোয়াসারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তবে এখনও ওদের সম্বন্ধে বহু তথ্য অজ্ঞাত।

প্রঃ মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কার ও তার বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে চাই।—সুগত ব্যানার্জি, জলাঘাটা, সিঙ্গুর, হুগলী।

উঃ ভূ-পৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধানলাভের পর বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, স্বর্ণ-পত্র তড়িৎবীক্ষণ অথবা অন্য কোন আহিত বস্তুকে ভাল-ভাবে অন্তরিত অবস্থায় রাখলেও আহিত বস্তুর তড়িতাধান ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। উক্ত ঘটনা থেকে সেদিন বিজ্ঞানীরা স্থির করেছিলেন, ভূপৃষ্ঠে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্বের জন্যই অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হলো 1910 সালের দিকে। ঐ সময় থেকে বিজ্ঞানীরা স্বর্ণপত্র তড়িৎ-বীক্ষণকে বেলুনে রেখে প্রেরণ করতে থাকেন ঊর্ধ্বাকাশে। 1910 থেকে 1914 সাল পর্যন্ত অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে-ছিলেন গোয়েকল, হেস, কোহ্লহর্স্টার প্রভৃতি বিজ্ঞানী। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, তড়িৎবীক্ষণ যতই ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করতে থাকে ততই তার তড়িৎমুক্তির হার বাড়ে। আরও তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর আয়ননের হারও বাড়তে থাকে।

অতঃপর তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন, উপরের দিকে বায়ুর আয়নিত হওয়া বা তড়িৎবীক্ষণের তড়িৎমুক্তি ভূপৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য হচ্ছে না। যদি তাই হতো তাহলে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উপরের দিকে গেলে ওর তীব্রতা কমতো।

এই নিয়ে সেদিন বিজ্ঞানীমহলে বেশ হৈ চৈও শুরু

হয়। তারপর স্থির হয়, পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য থেকে এক ধরনের রশ্মি সততই ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। তার কিছু কিছু ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকেও। এই রশ্মি এমন তীব্র ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত এমন দুর্ভেদ্য স্তরকেও ভেদ করে ছুটে আসে পৃথিবী পৃষ্ঠে। এমনকি মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্তও এগিয়ে যায়। এর উৎপত্তিস্থল হিসাবে বহির্বিশ্বকে ধরা হয় এবং এই কারণেই রশ্মিগুলির নাম মহাজাগতিক রশ্মি বা 'কসমিক রে'। তবে এর উৎস এবং প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা লাভ করা সম্ভব হয়নি বলা চলে। এখনও পদার্থবিদ্যা এবং বিশ্বতত্ত্বের (কসমোলজি) একটি জটিল সমস্যা হয়ে আছে। তোমরা বড় হলে এ সম্বন্ধে গবেষণা করতে পার।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সম্বন্ধে মিলিকান বলেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোন অংশে, নক্ষত্রপৃষ্ঠে ইত্যাদিতে এমন সব ভয়ঙ্কর জায়গা আছে যেখানে অতি প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসগুলো পরস্পর সংযোজিত হয়ে নতুন নতুন নিউক্লিয়াস গঠন করে চলেছে। এর ফলে নির্গত ভয়ঙ্কর তেজই বিকীর্ণ হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মিরূপে।

মহাজাগতিক রশ্মির উচ্চশক্তি ও ভেদন ক্ষমতা সম্বন্ধে ফার্মি মন্তব্য করেন, সুদূরের নক্ষত্রমণ্ডলী বা গ্যালাক্সী থেকে নির্গত এই রশ্মি নক্ষত্রমণ্ডলীর চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বারা অতি মাত্রায় ত্বরান্বিত হচ্ছে।

যেহেতু ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ওর তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাই এর উৎস যে বহির্বিশ্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবী নিরক্ষরেখা বরাবর ওর প্রাবল্য কম এবং উচ্চতর অক্ষাংশের দিকে প্রাবল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ধরে নেওয়া হয়েছে, এরা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার যেহেতু যে কোন উচ্চতায় এবং যে কোন অক্ষাংশে পশ্চিম থেকে আগত রশ্মির প্রাবল্য পূর্ব থেকে আগত রশ্মি অপেক্ষা অধিক, তাই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—বহিরাগত এই রশ্মিগুলিতে প্রাথমিক অবস্থায় ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট তড়িতাহিত কণিকা প্রোটনের প্রাধান্য থাকে। একে বলা হয় প্রাথমিক রশ্মি। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশের পর আবহমণ্ডলের পরমাণুর সঙ্গে এর সংঘাত ঘটে। ফলে উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কণিকা পজিট্রন ও মেসন।

প্রঃ সমুদ্র থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়? —দেবব্রত ধর, 15নং জগদ্দল, 24-পরগনা।

উঃ সমুদ্রজল থেকে দু উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম পদ্ধতি অনেকটা সাধারণ জলবিদ্যুৎ তৈরির মত। খাঁড়ির মুখে যেখানে জোয়ার ও ভাটার সময় জল সবেগে প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্ত হয় সেইখানে টারবাইন ঘুরিয়ে উৎপাদন করা হয় বিদ্যুৎ। উক্ত পদ্ধতিতে জাপান বেশ কিছু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। আমাদের দেশের সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর খাঁড়ি আছে। সেখানে এইভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি মার্কিন বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। সাগরপৃষ্ঠে জলের তাপমাত্রা প্রায় 25° সেলসিয়াসের মত। কিন্তু মাত্র হাজার মিটার গভীরে তাপমাত্রা ৫° সেলসিয়াসে নেবে গেছে। তাপমাত্রার এই ব্যবধানকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে পদ্ধতিটি বড্ড খরচবহুল এবং অনেকটা গুপ্ত রেখেছেন বলা যায়।

প্রঃ—গাছে বার্ষিক বলয় দেখা যায় কেন? প্রিয়জ্যোতি ভট্টাচার্য ও সৌরজ্যোতি ভট্টাচার্য, কালুহা-বীরভূম।

উঃ—যে সব গাছ বহুবর্ষজীবী তাদের কাণ্ডে প্রতি বছরই নতুন নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। কাণ্ডের মধ্যে কাঠের চারদিকে তাই কোষের ক্রমবৃদ্ধির ছাপ বৃত্তকারে দৃষ্ট হয়। ঐ ছাপ হিসেব করেই গাছের বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

প্রঃ—টিকটিকিরা দেওয়াল বেয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে কেমন করে? পবিত্র ঘোষ, বাপ্পা ঘোষ, প্রভাত ঘোষ, শম্পা ঘোষ, রাজু নন্দী,—কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউশন—হুগলী।

উঃ—টিকটিকিদের পায়ের পাতার এমনই গড়ন যে, খাড়া ও সমতল দেওয়ালের গায়ে পা ফেলে পাটা একটু উপরের দিকে টেনে তুললে দেওয়াল ও পায়ের পাতার ফাঁকে বায়ু শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাই আপনা হতেই তারা ঝুলে থাকতে পারে বা খাড়াভাবে ওঠানামা করতে পারে।

প্রঃ—আর. এন. এ. র পুরো নাম কি? জিন কি? কৃত্রিম জিনের আবিষ্কর্তা কি খোরানা? অমলেশ, দীপাঞ্জন, ও বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস। বগুলা উচ্চ বিদ্যালয়।

উঃ—আর. এন. এ. র. পুরো নাম রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। জীবকোষে অবস্থিত অম্লধর্মী যৌগিক পদার্থ এবং জীবের বংশগতি নিয়ামক জিন তথা ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি. এন. এ। এতে অবস্থিত এনজাইম, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতির সজ্জাক্রম নির্ভুলভাবে পাঠ করেন খোরানা এবং কোষ মধ্যস্থিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডি. এন. এ কে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে সমর্থ হন।

কালন্দী, মেদিনীপুর।

সুধাংশু পাত্র

শব্দকূট | সুগত ব্যানার্জি

সূত্র :—পাশাপাশি : 1. উত্তাপের জন্য যেখানে আগুন জ্বালান হয়।
3. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হার।
5. উল্টো করে পড়লে 'গাঢ়তা'।
6. যে পদার্থ অন্যকে জারিত করে।
8. এক নির্দিষ্ট দিকে বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে।
9. সময়ের সঙ্গে বস্তুর পথ দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের হবে।
10. যা বস্তুকে আমাদের চোখে দৃশ্যমান করে।
12. তড়িৎ আধান যুক্ত পরমাণু বা মূলক।
14. প্রবহমান আলোকধারার একটিকে বলে।
15. পদার্থের মধ্যেকার অণুগুলির গতিশক্তির ওপর নির্ভরশীল শক্তির এক রূপ।

উপরনিচ :—1. একটি ক্ষারক।
2. যে বস্তু শব্দ উৎপাদন করে।
4. উৎক্ষিপ্ত বুলেটের মধ্যের শক্তি।
5. ক্রমবর্ধমান বেগের পরিবর্তনের হার।
6. কোন যৌগ বা মৌলে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া।
7. বস্তুর অস্বাভাবিক অবস্থান হেতু তার কার্য করার সামর্থ্য নির্দেশক শক্তি।
10. আলোর উৎকৃষ্ট প্রতিফলক।
11. যার প্রভাবে মিথাইল অরেঞ্জ (কমলা) হলুদে হয়ে যায়।
13. যে কারণে বরফ দ্বারা জল ফোটানো যায়।

সিঙ্গুর, হুগলী

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

আগস্ট সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

লীলা মজুমদারের

কল্প-বিজ্ঞানের গল্প

আগস্ট সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ফোটো ক্যুইজের উপহার

ধীরেন্দ্রলাল ধরের

দুরন্ত যাত্রী

প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটোক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

পুজো সংখ্যায়

বিশেষ প্রবন্ধ

2001 সালে

জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বিমান বসু

রমাতোষ সরকার ॥ মৃন্ময়ী দাস

জয়ন্ত বসু ॥ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

এবং আরও অনেকে

নির্বাচিত প্রবন্ধ লিখবেন

সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র

অজয় হোম ॥ আবদুল্লাহ আল-মুতী

দিবাকর সেন ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী

অমরনাথ রায়

ও আরও অনেকে

৪টি রঙীন চিত্র কাহিনী

সিদ্ধার্থ ঘোষের নতুন খেলা

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান চিরকা

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN6 th Yr Vol – 4· AUGUST 1986/Regd.No.WBEC/25

ক্যুইজ বুকস সিরিজ

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পরিপূরক গ্রন্থই শুধু নয়, যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য।

প্রকাশিত হয়েছে

ক্লাস অ্যানুয়াল, মাধ্যমিক ফাইনাল ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্যের জন্য

ক্যুইজ

অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ ১০

অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ ১০

রনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ ১০

ন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ ১০

থ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ১০

। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও

দাম : 4·00 টাকা।